কোরানের গল্প

বড়ে আলি মিয়া

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৫৪

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

টুটু, মীনা, ছুটু, বুল্‌বুল্‌ ও মজ্‌নু

কল্যাণীয়েষু—

—বাবা

*
* · *

"কোর্-আন শরীফ" মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। ইতিপূর্ব্বে ইহার যাহা বঙ্গানুবাদ হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মবিশ্বাসী পাঠকদের জন্য, রসপিপাসুদের জন্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিশোর মনের যোগ্য করিয়া কেহ লিখিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। "কোর্-আন শরীফ" বিরাট গ্রন্থ—সুতরাং ইহার নানা বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকার সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু সকল কাহিনী সর্ব্ববয়সের পাঠকপাঠিকার উপযোগী নহে। ইহার মধ্য হইতে কতকগুলি গল্প ছোটদের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করা হইল।

দীর্ঘকাল হইতে শরীর অসুস্থ। সুতরাং অধিকাংশ গল্পই অকৃত্রিম সুহৃদ এবং সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায়, পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোলাম সর্ওয়ার লিখিয়া দিয়া আমার প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া নকল করিয়া দিয়াছেন শ্রীমান্ গোলাম সর্ওয়ার এবং কল্যাণীয়া শামসুল নেসা। ইঁহাদের সমবেত সাহায্য না পাইলে বইখানি হয়তো প্রকাশ করিবার শীঘ্র সুযোগ মিলিত না। ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩৬।৪।২, কাশীনাথ দত্ত রোড
বরানগর, কলিকাতা

গ্রন্থকার

গল্প-সূচী

পৃথিবী সৃষ্টির একেবারে প্রথম দিকের কথা। তখন এখানে কোন জীবজন্তু, পশুপক্ষী বা কীটপতঙ্গ কিছুই ছিলো না। সমস্ত দুনিয়ায় বাস করতো শুধু জিনেরা। তারা কেবলই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি মারামারি নিয়েই থাকতো, ভুলেও কখনো আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতো না। একদিন আজাযিল খোদার দরগায় আরজ (প্রার্থনা) করলো: হে প্রভু, আমাকে হুকুম দাও, আমি দুনিয়ায় গিয়ে জিনবংশ গারত

(ধ্বংস) করে দুনিয়া থেকে পাপ দূর করে দিই। খোদা তার আরজ মঞ্জুর করলেন। আজাযিল চল্লিশ হাজার ফেরেশ্‌তাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলো দুনিয়াতে; জিনদিগকে সৎপথে আনবার জন্যে অনেক সদুপদেশ দিলে; কিন্তু তারা সে কথাতে একেবারে কর্ণপাতই করলো না। আজাযিল কি আর করে? তখন তাদের ধ্বংস করে বেহেশ্‌তে ফিরে গেলো। জিনের দল নিশ্চিহ্ন হওয়ায় দুনিয়া খালি পড়ে রইলো।

দোজখ (নরক) সব সুদ্ধ আটটা। তার মধ্যে যে দোজখে দুনিয়ার সব চেয়ে বেশী গোনাহ্‌গারদের (পাপীদের) রাখা হয়, তার নাম সিজ্জীন। দুনিয়ার নীচে পাতাল এবং পাতালেরও অনেক নীচে সেই সিজ্জীন দোজখ। সেখানে দিনরাত শুধু দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। এত আগুন তবু সেখানে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে বাঘের ঔরসে এবং একটা ভেড়ীর গর্ভে আজাযিলের জন্ম হয়। এই আজাযিল ভাল মানুষের দুশ্‌মন। দুনিয়ার মধ্যে তার মতো পাপী এখন আর কেউ নেই। সে শুধু নিজে পাপ করে না; প্রলোভন দ্বারা সকলকে পাপের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু চিরকাল সে এমন ছিলো না। তার মতো ধার্ম্মিক এবং সৎ ফেরেশ্‌তারা অবধি হতে পারে নি। সত্যি-সত্যি একদিন সে সকল ফেরেশ্‌তাদের সর্‌দার ছিলো। খোদার নিকট

তার মরতবা (দাবী) আর সব ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিলো।

আজাযিল জন্মের পরে কিন্তু অন্য জানোয়ারদের মতো বৃথা সময় নষ্ট করে নি। সে খোদার এবাদতে মশ্‌গুল হয়ে পুরা একটি হাজার বছর কাটিয়ে দিয়েছিলো। সমস্ত দোজখে তিল পরিমাণ জায়গাও ছিলো না যেখানে দাঁড়িয়ে সে খোদার উপাসনা করে নি।

খোদা খুশী হয়ে তাকে সিজ্জীন দোজখ থেকে পাতালে আসবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এখানে এসেও তার মনে অহঙ্কারের লেশ মাত্র দেখা দিলো না। বরঞ্চ খোদাতা'লার এবাদতে আরো অধিক মনোযোগ প্রদান করলে। দেখতে দেখতে হাজার বছর কেটে গেলো এবং এমন এতটুকু জায়গা ফাঁক রইলো না, যেখানে দাঁড়িয়ে সে খোদার উপসনা করলে না। এমনি করে আরো হাজার বছর কেটে গেলো। খোদা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দুনিয়ার ওপরে নিয়ে এলেন। কিন্তু এত উন্নতি করেও সে খোদাকে ক্ষণকালের জন্যও ভুললো না। দিনরাত খোদার এবাদতে মশ্‌গুল হয়ে রইলো। করুণাময় খোদাতা'লা এবার তাকে প্রথম আশ্‌মানে তুলে নিলেন।

এমনিভাবে খোদাকে স্তবস্তুতিতে খুশী করে এক ধাপ এক ধাপ করে সে একেবারে সমস্ত আশ্‌মানে উঠতে লাগলো। এক এক আশ্‌মানে হাজার বছর করে সাত হাজার বছর ধরে

আহার নেই, নিদ্রা নেই, দিন-রাত কেবল রোজা আর নমাজ, নমাজ আর রোজা করে সে কাটালে। কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই, একমনে একপ্রাণে খোদার উপাসনায় মশ্‌গুল হয়ে রইলো। খোদা তার ওপর খুব বেশী খুশী হয়ে দোজখের না-পাক্ (অপবিত্র) জানোয়ারকে বেহেশ্‌তে আসবার অনুমতি দিলেন।

তা'হলে তোমরা দেখছো—না-পাক্ জানোয়ারও নিজের সাধনার বলে কত উন্নতি করতে পারলে। কোথায় ছিলো আর কোথায় এলো! বেহেশ্‌তে এসে তার মনে একটুকু দেমাক বা এতটুকু অহঙ্কার দেখা দিলো না। ফেরেশ্‌তাগণ যখন হাসিখুশী ও আমোদ-প্রমোদে রত থাকতো, তখনো আজাযিল খোদার এবাদতে মগ্ন হয়ে থাকতো। মনে তার সুখ নেই—প্রাণে শান্তি নেই, চোখ দিয়ে কেবল ঝর-ঝর ধারায় জল পড়তো; কেবলই সে খোদার কাছে এই আরজ করতোঃ হে এলাহি আল্‌মিন, তোমার এবাদাত বন্দেগী। কিছুই করতে পারলেম না। আমার গোনাহ্ মাফ করো। আমি বেহেশ্‌ত চাই না—আমি চাই তোমাকে।

এইরূপে বেহেশ্‌তের আমোদ-আহ্লাদ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত অগ্রাহ্য করে সে আরো হাজার বছর খোদার এবাদতে কাটিয়ে দিলে। এবার খোদাতা'লা তার ওপরে অতিশয় সদয় হয়ে তাকে ফেরেশ্‌তাদের সর্‌দার করে বেহেশ্‌তের খাজাঞ্চী করে দিলেন।

কিন্তু হলে কি হবে, তথাপি সে আল্লাহ্‌কে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুললো না। দিনরাত আল্লার নামে মশ্‌গুল হয়ে রইলো, আর মাঝে মাঝে বেহেশ্‌তের মিম্বারের ওপর উঠে আল্লাহ্‌-তা'লার উপাসনার উপকারিতা সম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাদের উপদেশ দিতে লাগলো। ফেরেশ্‌তাগণ তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেঃ আজাযিল খোদার অতিশয় পিয়ারা (প্রিয়)। যদি আমরা খোদার কাছে কখনো কোনপ্রকার বেয়াদপি করে ফেলি, তা'হলে তার সুপারিশে আমরা বেঁচে যাবো। খোদা তার কথা না শুনে পারবেন না। এমনই করে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে তার মর্‌তবা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু যার এত মরতবা তার আশা এখনো মিটলো না। এখনো খোদার এবাদত ছাড়া আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। নিরালায় বসে কেবল খোদার যিকির করতে লাগলো। এইরূপে আরও হাজার বছর কেটে গেলো; সজল নয়নে কেবলই সে খোদার কাছে আরজ করতে লাগলোঃ হে রহমান রহিম, তুমি আমাকে দোজখ থেকে বেহেশ্‌তে এনেছ। এখন আমাকে মেহেরবানি করে একবার 'লওহে-মহ্‌ফুযে' তুলে নাও।

খোদা তার আরজ মঞ্জুর করলেন। সেখানে গিয়েও খোদার নাম ছাড়া অন্য কিছুই মনের মধ্যে সে স্থান দিলে না; দিনরাত খোদার উপাসনায় একেবারে ডুবে রইলো। একদিন

সে দেখতে পেলে 'লওহে-মহ্ফুযের' এক জায়গায় লেখা রয়েছে, "একজন ফেরেশ্তা ছয় লক্ষ বৎসর খোদার উপাসনা করিবে। কিন্তু যদি সে একটিবারও খোদার আদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে সে চরম দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইবে। তখন হইতে তাহার নাম হইবে ইব্লিস্।" আজাযিল ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। কোন দিকে তার হুঁস নেই—ধীর স্থিরভাবে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোদার দরগায় আরজ করতে লাগলো।

এমনিভাবে পাঁচ লক্ষ বছর কেটে গেলো। একদিন খোদা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আজাযিল, এখানে কেহ যদি আমার একটিমাত্র আদেশ অমান্য করে, তবে তাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত?

আজাযিল প্রত্যুত্তর করলে: কেহ যদি আপনার আদেশ অমান্য করে, তা'হলে তাকে আপনার দরবার থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দেওয়া উচিত।

খোদা বললেন: বেশ কথা। তুমি এখানে ঐ কথাগুলো লিখে রাখ।

আজাযিল খোদার হুকুম পালন করলে।

তোমাদের হয়তো স্মরণ আছে, আল্লার নির্দ্দেশে আজাযিল জিনবংশ গারত করবার পরে দুনিয়া খালি পড়ে থাকে।

খোদার বোধ হয় খেয়াল হলো যে, তিনি জিনদের বদলে মানুষ দ্বারা দুনিয়া পূর্ণ করবেন। তিনি সেকথা ফেরেশ্‌তাদের বললেন। তারা জবাব দিলেঃ হে পরোয়ার দিগার, একবার তুমি জিন পয়দা করে ঠকেছো। তারা কেবল ঝগড়াঝাটি মারামারি করে দিন কাটিয়েছে। আবার এখন মানুষ সৃষ্টি করে ফ্যাসাদ বাড়িয়ে কি লাভ! আমরা ত তোমার এবাদতে মশ্‌গুল আছি।

খোদা হেসে বললেনঃ দেখ ফেরেশ্‌তাগণ! আমি কি তোমাদের চেয়ে বেশী বুঝি না!

এই কথা শুনে তারা খুব লজ্জা পেলে। তারা বিনয়ের সঙ্গে বললোঃ হে রহমান রহিম! তোমার খেয়াল বুঝবার ক্ষমতা কাহারো নেই।

খোদাতা'লা হযরত আদমকে সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি দুনিয়া থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়ে হযরত আদমের শরীর সৃষ্টি করাবার হুকুম দিলেন এবং দেহের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাবার পূর্ব্বে মাটিটুকুকে বেহেশ্‌তের একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

একদিন আজাযিল ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে হাজির। আদমের চেহারা দেখে সে খুব হাসতে লাগলো; তারপর তাকে নিয়ে এমন বিদ্রূপ সুরু করলো যে, ফেরেশ্‌তারা তাকে বললোঃ দেখ আজাযিল, খোদা যাঁকে

খলিফারূপে তুনিয়ায় পাঠাবার জন্য পয়দা করেছেন, তাঁকে নিয়ে তোমার এরূপ বেয়াদবী করা উচিত নয়।

ফেরেশ্‌তাদের কথায় আজাযিল কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করলো না, বরং অবজ্ঞাভরে বললো : বল কি ! খোদা এই মাটির ঢেলাকে খলিফারূপে তুনিয়ায় পাঠাবেন ! তিনি যদি একে আমার অধীন করে দেন, তা'হলে আমি তক্ষুনি একে গলা টিপে মেরে ফেলবো ; আর আমাকে যদি এর অধীন করে দেন তবে আমি কিছুতেই একে মানবো না।

আজাযিলের স্পর্দ্ধা দেখে ফেরেশ্‌তারা অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। আজাযিল সেই মাটির মূর্ত্তির সুমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি চিন্তা করলে, তারপর তার নাক দিয়ে তার শরীরের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে বড় মুস্কিলে পড়লো। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বের হয়ে এসে সেই মূর্ত্তির গায়ে থুথু দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

খোদার আদেশে এক শুভ মুহূর্ত্তে হযরত আদমের আত্মা তার শরীরে প্রবেশ করলো। তারপর তাঁকে বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত করিয়ে একটি অনিন্দ্যসুন্দর সিংহাসনে বসানো হলো। এইরূপে নিজের খলিফাকে সৃষ্টি করে খোদাতা'লা ফেরেশ্‌তাদের বললেন : আমি হযরত আদমকে তোমাদের চেয়ে বড় করে পয়দা করেছি। তোমরা একে সেজদা (প্রণাম) কর।

খোদার আদেশ পেয়ে ফেরেশ্‌তারা অতিশয় ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় আদম আলায়হাস্‌-সালামকে সেজদা করলো। কিন্তু আজাযিল মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো, সেজদা ত করলেই না—এমন কি মাথা পর্য্যন্ত নোয়ালো না।

ফেরেশ্‌তারা আজাযিলের এই স্পর্দ্ধা দেখে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলো।

খোদা আজাযিলকে বললেনঃ আজাযিল, আমার হুকুমে ফেরেশ্‌তাগণ আদমকে সেজদা করলো, কিন্তু তুমি তাকে সেজদা করলে না কেন?

আজাযিল জবাব দিলোঃ হে খোদা, আদমকে দুনিয়ার নাপাক্‌ মাটি থেকে পয়দা করেছো, কিন্তু তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো। আমি তাকে সেজদা করতে পারি না।

অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়ে খোদা বললেনঃ রে মূর্খ, আত্ম-অহঙ্কারে তুই আমার হুকুম অমান্য করেছিস্‌। জানিস্‌, তাকে মাটি থেকে পয়দা করবার ব্যবস্থা আমিই করেছি—আমিই তাকে ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে বড় করেছি, আর আমিই তাকে সেজদা করতে বলেছি। কিন্তু এত স্পর্দ্ধা তোর কিসে হলো? তুই এতদিন আমার এবাদত করেছিস্‌ সেইজন্য কি? কিন্তু তুই-ই না 'লওহে-মহ্‌ফুযে' লিখে রেখেছিস্‌ যে লক্ষ লক্ষ বৎসর আমার এবাদতে মশ্‌গুল হয়ে থাকলেও, আমার একটি মাত্র আদেশ অমান্য করলে সমস্ত এবাদত পণ্ড হয়ে যায়? তুই

আজ থেকে মরদুদ হয়ে গেলি। তুই আমার দরবার থেকে দূর হয়ে যা।

খোদা এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আজাযিলের চেহারা বিশ্রীরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলো। তার গায়ের রং হলো অত্যন্ত কালো, মুখ হলো শূকরের মুখের মতো। চোখ দুটি কপাল থেকে বুকের ওপরে নেমে এলো। তার নাম হলো ইব্‌লিস্।

আজাযিল নিজের দুর্দ্দশা দেখে মনে মনে খুব ভয় পেলে, কিন্তু বাইরে সে ভাব মোটেই প্রকাশ করলে না। খোদার দরগায় আরজ করলে ঃ হে খোদা, আমি নিজের আহাম্মকিতে যে পাপ করেছি তার শাস্তিভোগ আমাকে করতেই হবে। তার জন্য আমাকে যে দোজোখী করেছ, তাও আমাকে মানতে হবে। আমি জানি হাজার চেষ্টা করলেও আমার এ কসুর মাফ হবে না। তোমার দরবার থেকে চিরকালের জন্য চলে যাবার আগে আমি গোটা কয়েক আরজ পেশ্‌ করতে ইচ্ছা করি। আশা করি তুমি তা মঞ্জুর করবে।

খোদা বললেন ঃ বল্, তোর বলবার কি আছে ?

ইব্‌লিস্ বললে ঃ আমার প্রথম আরজ এই যে, আমাকে কেয়ামত (শেষদিন) পর্য্যন্ত স্বাধীনতা দাও।

খোদা সে আরজ মঞ্জুর করলেন।

ইব্‌লিস্ তার দ্বিতীয় আবেদন পেশ করলে। বললে ঃ আমাকে লোকচক্ষে অদৃশ্য করে দাও। আর কেহ জানতে

না পারে এমনি করে সকলের হাড় মাংস স্নায়ু মজ্জা ও শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতা দাও।

খোদা তাও মঞ্জুর করলেন।

তারপর ইব্‌লিস্‌ বললে ঃ লক্ষ লক্ষ বছর তোমার এবাদতে মশ্‌গুল থেকে সিজ্জীন দোজখ হতে বেহেশ্‌তে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কিন্তু তোমার তৈয়ারী সামান্য বান্দার ওপর বেয়াদবী করবার জন্য আমাকে শাস্তি দিলে! তোমার প্রিয় মানবের ওপর আমি তার প্রতিশোধ নেবো। তুমি আমাকে শয়তান করলে। আমি তোমার বান্দাকে শয়তান করে তৈরী করবো। যেমন সামান্য একটু কস্তুরে আমাকে নারকী করলে, তেমনি তোমার প্রিয় মানুষেরা দিনরাত তোমার রোজা নমাজ করলেও আমি তাদের সামান্য একটু ত্রুটি করবার চেষ্টা করবো, আর এমনি করে হাজার হাজার বান্দাকে দোজখে পাঠাবার ব্যবস্থা আমিই করবো। তুমি তাদের সৎপথে চালিত করবার জন্য অনেক নবী ও পয়গম্বর পাঠাবে; তাঁরা তাদের উদ্ধারের জন্য অনেক পরামর্শ, অনেক উপদেশ দান করবেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। আজ থেকে তোমার মানবের অনিষ্ট করাই হবে আমার একমাত্র কাজ।

এই বলে ইব্‌লিস্‌ ডানা মেলে দুনিয়ার দিকে উড়ে গেলো। সেই থেকে সে শয়তান তার প্রতিজ্ঞা কেমন করে

পূরণ করছে তা তোমরা দিনরাত দেখতে পাচ্ছ। খোদার ইমানদারের চেয়ে শয়তানের বেইমানদার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তা'হলে তোমরা দেখতে পেলে ইব্‌লিস্‌ লক্ষ লক্ষ বছর খোদার উপাসনা করে কত উন্নতি করেছিলো, একদিনের সামান্য একটু কসুরে তা সমস্তই নষ্ট হয়ে তার কত অধঃপতন হলো। সুতরাং তোমরা জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্য পথে চলতে চেষ্টা করবে। কখনো ভুলেও এক নিমেষের জন্য একটুও ত্রুটি করবে না। জীবনের একটু কসুরও খোদা মাফ্‌ ক্‌রেন না। তোমরা হয়ত মনে করবে প্রথমে একটু-আধটু কসুর করে পরে অনেক ভাল ভাল কাজ করবে, কিন্তু তা হয় না।
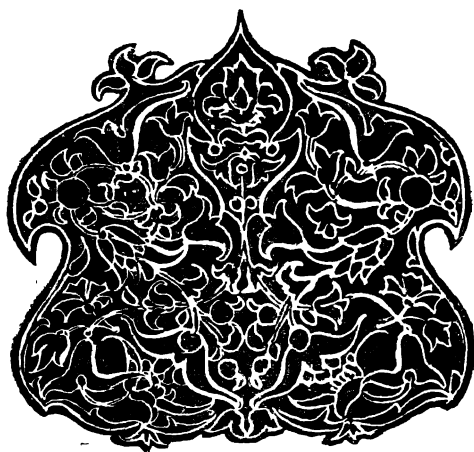
মাটির দ্বারা প্রস্তুত তুচ্ছ মানব আদমের জন্য আজাযিলের এই দুর্দ্দশা ঘটলো। আজাযিল সেই নিরপরাধ আদমকে জব্দ করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

খোদাতা'লা বেহেশ্‌তে বিচিত্র একটা উদ্যান রচনা করে নানা রকম সুন্দর সুন্দর ফুল ও ফলের গাছ সৃষ্টি করলেন। সেই বাগানের মাঝখানে দুটি গাছ সৃষ্ট হলো—তার একটির

নাম জীবন-বৃক্ষ অপরটির নাম জ্ঞান-বৃক্ষ। খোদা আদমকে সেই বাগানে বাস করবার অনুমতি দিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে খোদা সেই বাগানে আসতেন এবং আদমকে সঙ্গে নিয়ে এদিক সেদিক বেড়িয়ে আবার চলে যেতেন। খোদা আদমকে বললেন যে, বাগানের সমস্ত গাছের ফল সে খেতে পারে, কিন্তু জীবন-বৃক্ষের ও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল সে কখনো যেন ভক্ষণ না করে। এই গাছের ফল আহার করা মাত্র তার মৃত্যু ঘটবে।

এমনি করে অনেক দিন চলে যাবার পর খোদা মনে করলেন যে, আদমের একজন সঙ্গিনী সৃষ্টি করা প্রয়োজন। একদিন তিনি সমস্ত পশুপক্ষীকে আদমের নিকট নিয়ে এলেন এবং তাদের প্রত্যেকের নামকরণ করতে বললেন। আদম প্রত্যেক জীবের আলাদা আলাদা নাম রাখলেন। তারা চলে গেলে আদম চিন্তা করতে লাগলেন, খোদাতা'লা সকল জীবজন্তুকে জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন, কেবল মাত্র তিনিই একাকী রয়েছেন।

সেই রাত্রে আদম ঘুমিয়ে পড়লে খোদা তাঁর বাম পাঁজরা থেকে একটা হাড় বের করে নিয়ে তা দিয়ে একটি নারী সৃষ্টি করে তাঁর পাশে শুইয়ে রাখলেন। ঘুম ভাঙ্গলে পাশে একটি সুন্দরী নারীকে দেখে তিনি মনে মনে পরম বিস্ময়বোধ করলেন। এমন সময়ে খোদা সেখানে এলেন। তিনি

বললেন ঃ এর নাম বিবি হাওয়া। এ হলো তোমার সঙ্গিনী। তোমরা দুজনে একত্রে এই বেহেশ্‌তের বাগানে থাকবে, খেলবে, বেড়াবে ; কিন্তু সাবধান, সেদিন তোমাকে নিষেধ করেছি—আজ আবার তোমাকে ও তোমার সঙ্গিনীকে বলছি—যখন ইচ্ছা হবে এই বাগানের সকল রকম ফল আহার করবে, কিন্তু এই জীবন-বৃক্ষ ও সদসদ্‌-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল কখনো আহার করবে না।

এই বলে খোদাতা'লা চলে গেলেন।

সেই দিন থেকে আদম ও হাওয়া মনের সুখে সেই বাগানের নানা রকম ফলমূল খেয়ে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন হাওয়া একা একা বাগানে বেড়াচ্ছেন। এই সুযোগে শয়তান একটা সাপের মূর্ত্তি ধরে তাঁর কাছে এলো। সে সময়ে সিংহ, বাঘ, সাপ, গরু, হরিণ, ভেড়া, ছাগল সকলে একসঙ্গে খেলা করতো, কেউ কাউকে হিংসা করতো না। সাপ হাওয়াকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তোমরা কি এই বাগানের সব গাছের ফল খাও ?

হাওয়া জবাব দিলেন ঃ না, দুটি গাছের ফল খাওয়া আমাদের নিষেধ।

সাপ জিজ্ঞাসা করলো ঃ কোন্ গাছের ফল তোমরা খাও না ?

হাওয়া গাছ দুটি দেখিয়ে দিলেন।

সাপ বললেঃ কেন তোমরা এ দুটি গাছের ফল খাও না?

হাওয়া বললেনঃ জানি না। খোদা বারণ করেছেন।

সাপ বললেঃ খোদা তোমাদের বোকা বানিয়ে এখানে রেখেছেন। এই গাছের ফল খেলে তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যাবে, আর তোমাদের ওপর খোদার কোন কারসাজি চলবে না। তাই খোদা তোমাদের এই গাছের ফল খেতে বারণ করেছেন! কি সুন্দর আর কি মিষ্ট এই ফল তা তোমরা জান না।

সাপের কুপরামর্শে হাওয়ার মন দুলে উঠলো। তিনি ভাবলেন, তাই ত অমন সুন্দর ফল না জানি কেমন মিষ্ট! তিনি লোভ সামলাতে পারলেন না। একটা ফল ছিঁড়ে নিলেন। আধখানা নিজে খেয়ে অপর অর্দ্ধেক আদমের জন্য নিয়ে গেলেন। আদম হাওয়ার হাত থেকে সেই নতুন রকমের ফলটুকু নিয়ে সাগ্রহে খেয়ে ফেললেন।

শয়তান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে মনে মনে হাসতে লাগলো। ফল খাবার পরে তাঁরা সর্ব্বপ্রথম বুঝতে পারলেন যে, নিজেরা বস্ত্রহীন। তখন বড় বড় ডুমুরের পাতার সঙ্গে লতা গেঁথে তাঁরা লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময়ে খোদাতা'লা বাগানে বেড়াতে এলেন। তিনি আদম ও হাওয়াকে নিকটে ডাকলেন, কিন্তু তাঁরা

প্রতিদিনের মতো সুমুখে এলেন না। গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

খোদাতা'লা বললেন: আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়েছ?

আদম বললেন: হাওয়া আমাকে দিয়েছে।

হাওয়া বললেন: ঐ সাপ আমাকে খেতে বলেছে।

খোদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন: আমার আদেশ অমান্য করে যে পাপ আজ তোমরা করলে, বংশ পরম্পরাক্রমে এর ফল সকলকে ভোগ করতে হবে।

হাওয়াকে উদ্দেশ করে তিনি অভিশাপ দিলেন: তুমি প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করবার পর তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। চিরকাল তোমাকে পুরুষের অধীন হয়ে থাকতে হবে। পুরুষ তোমায় শাসন করবে।

আদমকে তিনি অভিশাপ দিলেন: তোমার শস্যক্ষেত্র আগাছা কুগাছা ও নানা কাঁটা গাছে ভর্ত্তি হয়ে যাবে। এক মুষ্টি অন্নের জন্য তোমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

সাপকে তিনি অভিশাপ দিয়ে বললেন: নির্ব্বোধ নারীকে কুপরামর্শ দিয়ে পাপ করিয়েছ; এর শাস্তি তোমাকে সারা জীবন ভোগ করতে হবে। যে মাটিতে মানুষ পা দিয়ে চলবে সেই মাটিতে সর্ব্বদা বুক পেতে তুমি চলবে এবং সেই

মাটি খেয়ে তোমাকে জীবনধারণ করতে হবে। এই নারীর বংশই হবে তোমার পরম শত্রু। তারা যখনই তোমাকে দেখবে, তখনই তোমাকে বধ করবার চেষ্টা করবে।

এই কথা বলে খোদা দুইখানা চামড়া তাঁদের পরিয়ে বাগান থেকে বের করে পৃথিবীতে নির্ব্বাসন দিলেন।

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া শয়তানের কুচক্রে পড়ে স্বর্গচ্যুত হলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌তা'লার অভিশাপে পৃথিবীতে এসে বাস করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করতে লাগলো। হযরত আদমের বংশধরগণের মধ্যে হাবিল ছিলেন অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ। তিনি রাতদিন কেবল খোদার বন্দেগীতে মশ্‌গুল হয়ে থাকতেন। অন্য কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো না।

ইব্‌লিস্ আদমের ওপরে হাড়ে হাড়ে চটেছিলো। সে কেবল সুযোগ খুঁজছিল, কি করে এঁর সন্তানগণকে পথভ্রষ্ট করা যায়। অবশেষে অনেক প্রলোভন দিয়ে কাবিল নামক পুত্রকে আপনার অধীনে আনতে সমর্থ হলো। কাবিল শয়তানের ফেরেবীতে পড়ে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলেও একবার আল্লাহ্‌তা'লার নাম মুখে আনতো না, বরং দিনে দিনে পাপের পথে অধিক অগ্রসর হতে লাগলো।

একদিন হাবিল ও কাবিল মনস্থ করলে যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যে একটা পশুকে কোরবানি দিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়ে দুটি পশু জবেহ করলে। ধার্ম্মিক ও পরহেজগার হাবিলের কোরবানি মঞ্জুর হলো, কিন্তু পাপী কাবিলের কোরবানি খোদা মঞ্জুর করলেন না।

কাবিল যখন বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ্ তার কোরবানি গ্রহণ করেন নি, তখন সে মনে খুব আঘাত পেলো। সে ভাবলো যে, হাবিলের কারসাজীতেই খোদাতা'লা তার ওপর বিমুখ হয়েছেন। সে প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ তোকে খুন করবো হাবিল! তোর জন্যই আমার কোরবানি মঞ্জুর হলো না।

কাবিলের কথা শুনে হাবিল তো অবাক! সে কাবিলকে বললো ঃ সে কি কাবিল?—আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে খুন করবে? তুমি যদি আমাকে

খুন কর, তবে আমার ও তোমার উভয়ের পাপ তোমাকে আজীবন বহন করতে হবে। তার পরে খোদাতা'লা তোমাকে এর শাস্তির জন্য দোজখে পাঠাবেন। তোমার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না। তুমি এমন পাপ কখনো করো না।

হাবিলের কথায় কাবিল আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে লাফ দিয়ে হাবিলের বুকের ওপরে উঠে তার গলা টিপে ধরলো। ধর্ম্মপ্রাণ হাবিল দম বন্ধ হয়ে মারা গেলো।

হাবিলকে মেরে ফেলে কাবিল ভয়ানক বিপদে পড়ে গেলো। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো—কি করবে, কিছুই স্থির করতে পারলো না। সে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। হাবিলের লাশটার কি গতি হবে তা সে ভেবে পেলো না।

এই ঘটনার পূর্ব্বে কোন মানুষ মরে নি, খুনখারাবিও কোনদিন হয় নি। কাজেই মৃতদেহ কিরূপে দফন-কাফন করতে হয় তা কারুরই জানা ছিলো না।

হাবিলকে খুন করে মাথায় হাত দিয়ে কাবিল আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলে! এখন সে কি করে, কোথায় যায়, কার পরামর্শ লয়?—

আল্লাহ্‌তা'লা কাবিলের বিপদ বুঝতে পেরে একটি কাককে সেই স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। কাকটি ঠোঁট দিয়ে

ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মাটি খুঁড়তে লাগলো। কাকের এই ব্যাপার দেখে কাবিল যেন অকূলে আশ্রয় পেলে। ঐরূপ ভাবে মাটি খুঁড়ে কাবিলকে তো অনায়াসে মাটিতে পুঁতে রাখা যায়। কথাটা মনে হতেই কাবিল একখানা অস্ত্র সংগ্রহ করে এনে মাটি খুঁড়ে হাবিলকে কবর দিলো; তারপর অনুতপ্ত হয়ে ভ্রাতার শোকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

হযরত আদম আলায়হাস্ সালামের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিলো ; কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি—আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণই ছিলো না। তারা দিনে দিনে অনাচারী—পাপাচারী হয়ে উঠতে লাগলো। শেষে এমন অবস্থা হলো—পরশ্রীকাতরতা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা এবং ঝগড়া ও মারামারি তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়ে পড়লো। সর্ব্বদা

পাপাচরণ করা এবং পাপকার্য্যে ডুবে থাকা তাদের প্রকৃতি হয়ে উঠলো। তাদেরে ধর্ম্মপথে আনবার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নূহ্ নবীকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে তাদের সৎপথে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত মাত্র করলো না। বরঞ্চ হাসি-মস্কারা করে এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাঁকে বেয়াকুব বানাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না। কেমন করে কাফেরদিগকে ধর্ম্মপথে আনা যায় সেই কথা তিনি দিনরাত ভাবতেন। তিনি বার বার তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু তারা উত্যক্ত হয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে প্রহার এবং নির্য্যাতন করতে সুরু করলো। নির্ম্মম প্রহারের ফলে তিনি কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। হুঁশ হলে পুনরায় পাপাচারীদিগকে সদুপদেশ দিতেন। এমনি করে অনেক দিন কেটে গেলো। অবশেষে তিনি হতাশ ও বিরক্ত হয়ে খোদার দরগায় হাত তুলে প্রার্থনা করলেনঃ হে রহমান রহিম, আমি তোমার আদেশ বহন করে কাফেরদের মধ্যে এসে তাদের ধর্ম্মপথে আনবার জন্য সহস্র প্রকারে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে গ্রহণ করে নি—তোমাকে মর্য্যাদা দেয় নি। তোমার পুনরাদেশের প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি। তুমি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করো।

তাঁর প্রার্থনা খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছালো। তিনি জিবরাইল ফেরেশ্‌তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

জিবরাইল খবর দিলেন: খোদাতা'লা দুনিয়ার ভার আর সহ্য করতে পারছেন না, তিনি শীঘ্রই জলপ্লাবন দ্বারা দুনিয়া ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেছেন। তিনি তোমাকে এবং তোমার পুত্রকন্যাদের অতিশয় স্নেহ করেন। তাই তোমাদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

নূহ প্রশ্ন করলেন: কি করে আমরা রক্ষা পাবো?

জিবরাইল জবাব দিলেন: একটা মস্ত বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করো, তারপর কি করতে হবে পরে জানতে পারবে।

জিবরাইলের পরামর্শ অনুযায়ী নূহ জাহাজ তৈরী করতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে অনেক পরিশ্রম ও পরিকল্পনায় একটি প্রকাণ্ড জাহাজ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হলো। জাহাজটি এত বড় হয়েছিল যে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ তেমন দেখে নি। লম্বায় দু'হাজার হাত এবং চওড়ায় আটশত হাত, উঁচু হয়েছিল আরো ছয়শত হাত।

জাহাজ প্রস্তুত হয়ে গেলে জিবরাইল একদিন দেখতে এলেন। নূহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি কেমন করে জানতে পারবো কোন্ দিন জলপ্লাবন আরম্ভ হবে? আর সে সময় আমাকে কি করতে হবে?

জিবরাইল বললেন : যখন রান্নার চুল্লি থেকে হু-হু করে জল উঠবে তখন বুঝবে যে মহাপ্লাবনের আর দেরী নেই। তখন তুমি যত প্রকার পশুপক্ষী আছে প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া জাহাজে তুলে নেবার ব্যবস্থা করবে। তারপর তোমার পরিবার ও সন্তানসন্ততি সহ জাহাজে উঠবে।

কয়েকদিন পরে এক অপরাহ্নে কাফেররা নূহের কাছে এসে বললে : জাহাজ তো তৈরী করলে নূহ সাহেব, কিন্তু এর দ্বারা করবে কি? কাছে তো নদী বা সাগর কিছুই নেই, তোমার জাহাজ ভাসবে কোথায়? মাটির ওপর দিয়ে তোমার জাহাজ চলবে নাকি? এই জাহাজে চড়ে তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যাবে নাকি?...এই বলে তারা নিজেদের রসিকতায় দাঁত বার করে হো-হো করে হাসতে হাসতে চলে গেলো।

নূহ একদৃষ্টে তাদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন : খোদা, সৎপথে আসবার মতো বুদ্ধি এদের দাও।

একদিন নূহ নবীর স্ত্রী ভাত রাঁধছিলেন। এমন সময়ে জ্বলন্ত চুলা থেকে হু-হু করে জল উঠতে লাগলো। তিনি ছুটে গিয়ে স্বামীকে এ সংবাদ জানালেন। নূহ বুঝতে পারলেন প্লাবনের আর বেশী দেরী নেই। তিনি সকল রকম পশুপক্ষী এক এক জোড়া জাহাজে তুলবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর কাজ শেষ হলে আল্লাহ্ তা'লা আস্মানের দরজা খুলে

দিলেন। ঝম্-ঝম্ করে অজস্রধারায় অবিরাম বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। চল্লিশ দিন অবিরল বৃষ্টি!—গাছপালা, ঘরবাড়ী, পাহাড়-পর্ব্বত—সমস্ত ডুবে একাকার হয়ে গেলো।

নূহের জাহাজ জলের ওপরে ভেসে বেড়াতে লাগলো। একদিন দু'দিন করে একমাস-দু'মাস—ক্রমে ছয় মাস আট দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। দুর্য্যোগ কেটে সুবাতাস বইতে আরম্ভ করলো। আস্তে আস্তে জল কমতে সুরু হলো।

জাহাজ তখনো এদিকে ওদিকে ভেসে চলছিলো। চলতে চলতে একদিন জুদী নামক একটি পাহাড়ে জাহাজ এসে ঠেকলো। জাহাজ থেকে নামবার সময় হয়েছে কিনা নূহ বুঝতে না পেরে দাঁড়কাক দুটিকে ছেড়ে দিলেন। চারদিকে পচা জীবজন্তুর মৃতদেহ পেয়ে দাঁড়কাকেরা মনের আনন্দে তা ভক্ষণ করতে লাগলো। সুতরাং জাহাজে ফিরে যাবার কথা আর তাদের মনে রইলো না।

দাঁড়কাকের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে নূহ পায়রাদের ছেড়ে দিলেন। পায়রারা কিছুক্ষণ পরে কচি পাতা শুদ্ধ একটি ছোট্ট ডাল ঠোঁটে করে নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এলো। নূহ বুঝতে পারলেন, জল কমে গেছে এবং গাছে গাছে কচি কিশলয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ থেকে তিনি অনুমান করতে পারলেন না যে, এখনো জাহাজ থেকে নামবার সময় হয়েছে কিনা। অতঃপর তিনি একটি মোরগকে জাহাজ

থেকে নামিয়ে দিলেন। জল একেবারে কমে যাওয়ায় মাটির ওপর নানা রকম মরা পোকা-মাকড় দেখতে পেয়ে সে আর জাহাজে ফিরে গেলো না। এবার নূহ বুঝতে পারলেন যে, জল প্রায় শুকিয়ে গেছে, এখন জাহাজ থেকে নামবার সময় হয়েছে। কিন্তু খোদার আদেশ না পেলে তো জাহাজ থেকে অবতরণ করতে পারেন না। সুতরাং তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

আরো দিন কয়েক কেটে যাবার পর একদিন জিবরাইল এসে তাঁকে জাহাজ থেকে নামতে বললেন। তাঁর কথামত নূহ তাঁর পরিবারবর্গ এবং জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি নিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। এবার তিনি যেন নূতন দুনিয়া দেখলেন। খোদা যেন জলপ্লাবন দিয়ে ধরণীর সমস্ত পাপ একেবারে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন। তিনি সুখ ও সম্ভোগের সঙ্গে পুনরায় বসবাস করতে আরম্ভ করলেন।
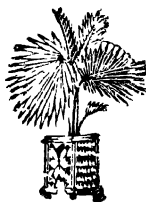
মহাপ্লাবনের পর বহু বৎসর কেটে গেছে।

আরবে আদ নামক একটা জাতি অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। তারা খোদাকে মানতো না—ইচ্ছা মতো যা খুশী করতো। কখনো পাথর, কখনো পুতুল, কখনো গাছপালাকে পূজা করতো। খোদাতা'লা তাদের হেদায়েত করবার জন্য হুদ্‌কে (আঃ) সৃষ্টি করলেন। হুদ তাদের এই কুকার্য্য দেখে মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হলেন। তিনি আপনার জ্ঞাতিবর্গকে ডেকে বললেনঃ তোমাদিগকে কুপথ থেকে সৎপথে আনবার জন্যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন।

যদি তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান না আন, তবে তিনি কঠিন গজব তোমাদের ওপর নাজেল করবেন। তোমরা আল্লাহ্-তা'লার এবাদত কর। আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। তিনি দয়ালু ও মহান্।

কাফেররা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তুমি কি ভেবেছ যে, তোমার কথা মতো আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ছেড়ে তোমার নিরাকার আল্লার এবাদত করবো ? ও সব চালাকী আমাদের কাছে চলবে না। যদি বেশী বাড়াবাড়ি করো তবে মেরে তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

হযরত হুদ তাদের কথা গ্রাহ্য মাত্র করলেন না। তিনি এই কুপথগামী লোকদিগকে ধর্ম্মপথে আনবার জন্য যথাসাধ্য উপদেশ দিতে লাগলেন। মাত্র অল্প কয়েকজন লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলো। অধিকাংশ লোকই তাঁর উপদেশ শুনলো না, অবহেলা ভরে বললোঃ হুদ, তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছুই নও। বড় বড় বক্তৃতা করে আমাদের মধ্যে সম্মান লাভ করতে চাও, এই তো তোমার উদ্দেশ্য। যদি আল্লাহ্‌তা'লার শিক্ষা দেবার দরকার হয়, তা'হলে তিনি অন্য ভাবে আমাদের শিক্ষা দেবেন। এজন্য তুমি অত মাথা ঘামাও কেন ? তুমি নিজের চরকায় তেল দেওগে, আমাদের জন্য ভেবো না।

হযরত হুদ যখন লোকদিগকে সৎপথে আনতে পারলেন না, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট মনের দুঃখে আরজ করতে লাগলেন ঃ হে রহমান রহিম, আমার কথায় এরা কর্ণপাত মাত্র করলে না। এরা বড় পাপী। তুমি ছাড়া এদের শিক্ষা দিতে পারে এমন আর কেউ নেই। তুমি এদের কঠিন শাস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও তোমার অস্তিত্ব। তুমি সর্ব্বশক্তিমান—তুমি এদের চেতনা জাগ্রত করো।

খোদাতা'লা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এরপর হুদ ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ রেখে নীরবে নিজের ঘরসংসারের কাজে মনঃসংযোগ করলেন।

কাফেররা হুদকে এইরূপে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো ঃ হুদ এবার ঠিক বুঝেছে, আমাদের বোকা ঠকানো অত সোজা নয়; তাই চুপচাপ বসে গেছে ঘর নিয়ে। বেচারা এতো গলাবাজি করলে, কিন্তু সবই পণ্ড হলো।

একদিন আল্লাহ্ হযরত হুদকে জানিয়ে দিলেন ঃ এবারে পৃথিবীতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হবে। তোমার পরিজনবর্গ এবং সামান্য দু'চারজন অনুচর যা আছে তাদের সঙ্গে নিয়ে একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করো।

খোদার আদেশ পেয়ে হুদ আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে একটি গহ্বরে গিয়ে লুকোলেন। অতঃপর ভীষণ

ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণিবায়ুতে মাটির ওপরে ঘরবাড়ী গাছপালা কিছুই আর দাঁড়িয়ে রইলো না, সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেলো।

তারপর ধীরে ধীরে প্রকৃতি শান্ত হলো। তখন দেখা গেলো আদজাতীয় লোকদের ঘরবাড়ীর কোন চিহ্নমাত্র নেই, এবং তারাও সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

খোদা পাপীদেরে এই রকমেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ছামুদ জাতি আরবের অন্তর্গত হজর ও ওয়াদিলকোর অঞ্চলে বাস করতো। তারা পাথর কেটে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করতে জানতো। জীবজন্তু মারবার জন্যে পাথর কেটে আশ্চর্য্য রকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতো। এদের মধ্যে কতক শ্রেণীর লোক পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। এরা আল্লাহ্‌তা'লাকে মানতো না। যা-কিছু বড় এবং অদ্ভুত তাদের চক্ষে লাগতো তারই প্রতিমূর্ত্তি পাথর দ্বারা তৈরী করে পূজা করতো। তা ছাড়া দিনরাত ঝগড়া ও দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে থাকতো। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের মধ্যে হযরত ছালেহ্‌কে নবীরূপে পাঠালেন। হযরত

ছালেহ্ তাদের ডেকে বললেনঃ ভাই সব, খোদা তোমাদের এই মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, আবার এই মাটিতেই লয় করবেন। তাঁর কথা একবার ভেবে দেখ; তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তোমরা অজ্ঞান-অন্ধকারে পড়ে আছ। আজ তোমাদের কাছে আমি পরমার্থিক আলো নিয়ে এসেছি। মনে করে দেখ, আদ জাতি হযরত হুদের কথা শোনে নি। এজন্য তারা কিরূপ ভাবে তোমাদের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেলো। যাঁর কৃপায় এই পাহাড়ের ওপর এমন সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে বাস করছো, তাঁর কথা একবার চিন্তা করো।

একদল লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলো। কিন্তু যারা অর্থশালী, বলশালী এবং নিজেদেরে খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে মনে করতো, তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত মাত্র করলো না। বরঞ্চ তাঁর হিতোপদেশে উত্যক্ত হয়ে তারা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো এবং দিনরাত ষড়যন্ত্র করতে লাগলো, কি করে হযরত ছালেহ্ ও তাঁর অনুচরবর্গকে হত্যা করা যায়। অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে তারা ছালেহ্ ও তাঁর অনুচরবর্গকে আক্রমণ করলো, কিন্তু আল্লার অনুগ্রহে তাদের সকল অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেলো। ছালেহ্ ও তাঁর অনুচরবর্গ অক্ষত দেহে রক্ষা পেলো, কিন্তু আততায়ীগণ সদলে ধ্বংস হলো।

ছামুদেরা বিধ্বস্ত হলে কাফেররা অধিকতর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠলো। তারা ছালেহ্‌কে মারবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর হয়ে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সামাজিক ভাবে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্য সর্ব্বদা উপহাস ও বিদ্রূপ করতে লাগলো এবং পাগল ও মিথ্যাবাদী বলে গুজব রটাতে লাগলো। তাদের মধ্য হতে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ছালেহ্‌কে ডেকে বললেন: তুমি যে আল্লার নবীরূপে আমাদের কাছে এসেছ বলে বলছ, কি করে আমরা বুঝতে পারবো যে তুমি সত্যি আল্লার পয়গম্বর।

ছালেহ্ তখন আল্লাহ্‌পাকের কাছে আরজ করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং নিকটবর্ত্তী পাহাড় দ্বিখণ্ডিত করে তার মধ্য থেকে একটা উট বের করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ছালেহ্ সেই উটকে নিয়ে কাফেরদের কাছে গেলেন, বললেন: তোমরা আমার কাছে তাঁর চিহ্ন দেখতে চেয়েছো তাই খোদাতা'লা এই উটটিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তোমরা কেউ এর অনিষ্ট করো না, বরং একে ঘাস ও জল দিও। এর প্রতি অত্যাচার করলে খোদার গজব (রোষ) তোমাদের ওপর পতিত হবে।

কাফেররা উটটিকে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো; তারা মনে করলো এটা একটা সামান্য জন্তু ছাড়া আর কিছুই

নয়। ছালেহ্ সুধু তাদের ভয় দেখানোর জন্যে এটিকে এনেছে। খোদার প্রেরিত কোন চিহ্নই এর গায়ে নেই। এ রকম উট তো তারা হামেশাই জবেহ্ করে ভক্ষণ করছে। একে যদি নিত্য খাদ্যজল দেওয়া হয়, তা'হলে তাদের জন্তুগুলো আধপেটা খেয়ে মরার দাখিল হয়ে পড়বে। তার চেয়ে এই উটটিকে রাত্রিকালে হত্যা করে সকলে ফলার করবে।

উটটিকে বধ করেও যখন তাদের কোন অনিষ্ট হলো না, তখন তারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। তারা হযরত ছালেহ্কে নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্রূপ করতে লাগলো। অবশেষে এমন দুর্গতি তাঁর করলো যে, দেশে বাস করা তাঁর দায় হয়ে উঠলো। তিনি নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্তা'লার কাছে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করতে লাগলেন, বললেন: হে করুণাময়, হে দীন-দুনিয়ার মালিক! আমি কিছুতেই এদের ভ্রম ঘুচাতে পারলাম না। তুমি যদি এদের শাস্তি না দাও, তবে হয়তো শীঘ্রই এরা আমাকে বধ করবে। তুমি উপযুক্ত বিচার করো।

তাঁর প্রার্থনা আল্লাহ্ মঞ্জুর করলেন।

এই ঘটনার তিন দিন পরে রাত্রিশেষে ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হলো। অবিশ্বাসী ছামুদদের ঘরবাড়ী সব ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেলো এবং তারাও সেই ভগ্নস্তূপের নীচে সমাধি লাভ করলো। পৃথিবীর বুকে জীবিত রইলেন হযরত ছালেহ্ ও তাঁর অনুচরবর্গ।

বেবিলন দেশের নাম হয়তো তোমরা শুনেছো। সেই দেশের সম্রাট্ নমরুদ ছিলেন যেমন অহঙ্কারী তেমনি অত্যাচারী। রাজকোষে ছিলো তাঁর প্রচুর মণিরত্ন, ধন-ঐশ্বর্য্য ; দেহে অমিত বীর্য্য—অগণিত লোকলস্কর।

একবার অগণিত সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি অভিযানে বের হলেন। দেশের পর দেশ তাঁর করায়ত্ত হতে লাগলো। চারদিকে বয়ে গেলো রক্তের নদী—শোনা যেতে লাগলো নিপীড়িতের আর্ত্তনাদ—দুর্ব্বলের হাহাকার—বুকফাটা ক্রন্দন ! তবু বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই—শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস—জয়

আর জয়। গ্রীস, তুরস্ক, আরব, পারশ্য ও ভারতবর্ষে তাঁর বিজয়-নিশান উড়তে লাগলো। তিনি হলেন অর্দ্ধপৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। দম্ভে তাঁর বুক উঠলো ফুলে—দুনিয়াটাকে খেলাঘর বলে তাঁর মনে হতে লাগলো।

একদিন নমরুদ আম্‌দরবারে বসে অমাত্য-পারিষদবর্গ নিয়ে খোসগল্পে মশ্‌গুল আছেন, এমন সময়ে একজন ফকির এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে: সর্ব্বশক্তিমান খোদার নামে কিছু দান করুন জাহাঁপনা।

নমরুদ কথা শুনে চম্‌কে উঠলেন ; বললেন: সর্ব্বশক্তিমান খোদা! সে কি বলছো তুমি? সর্ব্বশক্তিমান আমি।

সম্রাটের কথার ওপরে কথা চলে না—সুতরাং অমাত্যবর্গ ক্ষুণ্ণমনে নীরব হয়ে রইলেন।

ফকির বললো: সম্রাট্‌, আপনি ভুল করছেন—এমন পাপ কথা মুখে উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে নেই। তিনি এত বিরাট যে, তাঁর তুলনায় আপনি নিতান্ত তুচ্ছ!

নমরুদ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন: এতো বড় স্পর্দ্ধা, আমার কথার ওপরে কথা! প্রতিহারী...

প্রতিহারী এসে জোড়হাতে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

নমরুদ ক্ষিপ্তকণ্ঠে হুকুম করলেন: এই ভিখারীটার গর্দ্দান চাই।

প্রতিহারী ফকিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শিরশ্ছেদের জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলো।

অমাত্যবর্গ তাঁদের সম্রাটকে চিনতেন, তাই তাঁরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না, কিন্তু মনে মনে দুঃখ বোধ করতে লাগলেন।

নমরুদ সভাসদদের ডেকে বললেনঃ আপনারা আজই আমার রাজ্যমধ্যে প্রচার করে দিন—আমি সর্ব্বশক্তিমান—আমি খোদা। যে আমাকে ছাড়া অন্য খোদার বন্দনা করবে সে সবংশে নিহত হবে।

অমাত্যগণ নিরুপায়। তাঁরা তখনই রাজাদেশ দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

দেশের লোকেরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো—অন্তঃপুরে মেয়েরা কানে আঙুল দিলে। সামান্য মানুষের এত বড় স্পর্দ্ধা! বামন হয়ে আকাশে খেলাঘর নির্ম্মাণের সাধ! কিন্তু প্রতিকার নেই। গোপনে গোপনে তারা খোদার উপাসনা করতে লাগলো। প্রকাশ্যে নমরুদের আদেশ পালন করবার ভাণ করা ছাড়া কোন উপায় রইলো না।

নমরুদ অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; সুতরাং দিনে দিনে স্পর্দ্ধা তাঁর বেড়েই চলেছিলো। আপনার নানা রকমের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রেখে দিয়ে

রাজধানীর সকলের ওপরে আদেশ দিলেন : দুধকলা দিয়ে আমার মূর্ত্তি পূজা করতে হবে। যে আদেশ অমান্য করবে তার গর্দ্দান যাবে।

প্রাণের দায়ে সবাই নমরুদের খেয়াল অনুসারেই চলতে লাগলো। নমরুদের অনুগত ভৃত্য আজর—প্রভু-অন্ত প্রাণ। তাঁর দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র ইব্রাহিম একদিন এমন একটি কাজ করলেন, যা দেখে আতঙ্কে সকলের বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হলো।

নমরুদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়েছিলেন কোন উৎসবে যোগদান করতে—ফিরে এসে দেখতে পেলেন তাঁর প্রতিমূর্ত্তিগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! নমরুদ সেদিক পানে চেয়ে বজ্রগম্ভীর চীৎকার করে বললেন : কে একাজ করলে?

ইব্রাহিম নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন, বললেন : আমি করেছি।

সকলে বালকের দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হলো। এই নির্ভীকতার যে কি পরিণাম, তা কল্পনা করে সকলে শিউরে উঠলো।

নমরুদ ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন : কেন? কেন করলে?

ইব্রাহিম সাহসে বুক ফুলিয়ে বললেন : যে সামান্য মানুষ হয়ে খোদা হবার স্পর্দ্ধা করে তার শাস্তি দিয়েছি। এখনো

সাবধান হোন জাহাঁপনা—নইলে খোদা আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

অমাত্যবর্গ অবাক। এতো বড় উচিত কথা মুখের ওপর কেউ কোন দিন তাঁকে বলে নি।

নমরুদ হুঙ্কার দিলেন: এই, কে আছিস্?

মুক্ত তরবারি হস্তে প্রতিহারী এসে কুর্নিশ জানালে।

নমরুদ হুকুম করলেন: এই মুহূর্তে এর গর্দ্দান চাই।

জল্লাদের হাতের অস্ত্র উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করে উঠলো। নমরুদ তাকে থামবার ইঙ্গিত জানিয়ে দু'হাত আন্দোলিত করে বললেন: না—না—না, বধ করো না—এত আরামে এর মৃত্যু হতে পারে না; একে আগুনে দগ্ধ করে হত্যা করতে হবে। তোমরা সবাই কাঠের যোগাড় করো।

জীবন্ত মানব দগ্ধ করা একটা কৌতুককর ব্যাপার। সুতরাং লোক-লস্কর, পাইক-সেপাই বন-বাদাড় উজাড় করে সহরের বাইরে এক ময়দানে কাঠের স্তূপ করতে লাগলো। কিছুকাল পরে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে বিরাট স্তূপীকৃত কাঠের ওপরে ঘি ঢেলে এমন অগ্নিকুণ্ড করা হলো যার তাপে এক মাইলের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে—নমরুদ সেদিক পানে চেয়ে চীৎকার করে বললেন: শীঘ্র ইব্‌রাহিমকে আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।

সিপাই-শান্ত্রী করযোড়ে নিবেদন করলেঃ জাহাঁপনা, আধ মাইলের মধ্যে যে-সব পাখী উড়ছিলো তারা অবধি পুড়ে মরে গেছে। আগুনের নিকটবর্ত্তী না হলে কি করে আমরা ইব্রাহিমকে ওর মধ্যে ফেলতে পারি?

নমরুদ দেখলেন কথাটা সত্য, কিন্তু তথাপি মুখ বিকৃত করে চীৎকার করে উঠলেনঃ তবে কি তাকে ছাইএর মধ্যে ফেলতে চাও নাকি? কাঠের সঙ্গে কাঠ বেঁধে চরকের মতো তৈরী করো—তার সঙ্গে ইব্রাহিমকে বেঁধে দূর থেকে নিক্ষেপ করো।

ঠিক-ঠিক, একথাটা কারুর মনেই হয় নি। ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলতে না পেরে উৎসাহটা কেমন ঝিমিয়ে এসেছিলো। সুতরাং এবার সকলেই পৈশাচিক আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলো।

নমরুদের হুকুম মতো চরকের কাঠের আগায় ইব্রাহিমকে বেঁধে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দূর থেকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য—যে প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখা এতক্ষণ দাউ-দাউ করে জ্বলছিলো—ইব্রাহিম আগুনে পড়বামাত্র আগুনের ফুল্কিগুলো বিচিত্র রঙের ফুলে পরিণত হলো। যে-সকল কাঠ অগ্নিদগ্ধ হয়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছিলো মুহূর্ত্তমধ্যে সেগুলো পত্র-পুষ্পে ভরে উঠলো। দেখতে

দেখতে সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড পুষ্প-উদ্যানে পরিণত হলো। তার মধ্যে ইব্‌রাহিম এক জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে হাসছেন !

নমরুদ এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন ; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই—পরক্ষণেই চীৎকার করে বললেন ঃ হতভাগ্যকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলো।

নমরুদের হুকুম পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একটা পাথরের কণাও তাঁর গায়ে আঘাত করলো না—সব পাথর জমাট বেঁধে মেঘের রূপ ধরে ইব্‌রাহিমের মাথায় ছায়া করে রইলো।

ব্যাপার দেখে নমরুদ বুঝতে পারলেন—অনুচরবর্গকে বেশী দিন তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের কথা গায়ের জোরে বিশ্বাস করানো চলবে না, কিন্তু বাইরে সে কথা প্রকাশ করলেন না। বললেন ঃ ও ছোক্‌রা যাদু জানে—যাদুবিদ্যার গুণে এই সব করছে।

ইব্‌রাহিম আগুন থেকে বেরিয়ে এসে নমরুদকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ দেখলেন জাহাঁপনা, খোদা যাকে রক্ষা করেন—কেউ তাকে মারতে পারে না ; তাই বলছি, অহঙ্কার ত্যাগ করে খোদার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

নমরূদ বিরস কণ্ঠে বললেন : তোর খোদার নিকটে তো কিছু আমি চাই না, তবে নিরর্থক তাকে মানতে যাবো কেন ?

ইব্‌রাহিম বললেন : এখন চান না বটে, কিন্তু আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি—এই সাম্রাজ্য তিনিই আপনাকে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন।

নমরূদ ক্রোধে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন : এত বড় স্পর্দ্ধা, তোর খোদা আমাকে ধ্বংস করবে! শোন্ ইব্‌রাহিম, তোর খোদাকে খুন করে আমি তার রাজ্য কেড়ে আনবো।

কিন্তু খোদা যে আকাশে থাকেন এই নিয়েই বাধলো গোল, সেখানে যাওয়া যাবে কি উপায়ে তাই হলো নমরূদের চিন্তার বিষয়।

মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ-সভা বসলো। অনেক বাদানুবাদ এবং বিতর্কের পর মন্ত্রীরা একমত হয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন, যদি চারটি শকুনি সংগ্রহ করা যায়, তবে তাদিগকে একটি জলচৌকির চারপাশে বেঁধে প্রত্যেকের মুখের সুমুখে কিছু দূরে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে রাখলেই তারা মাংসের লোভে ওপরের দিকে উড়ে উঠতে থাকবে—তা'হলে আকাশের ওপরে খোদার দেশে যেতে পারা যাবে।

যুক্তিটা নমরূদের মনঃপূত হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ শকুনি ধরে আনবার জন্যে সিপাই-শান্ত্রীর ওপরে হুকুম করলেন।

চারটা শকুনি অতি অল্প দিনেই সংগৃহীত হয়ে গেলো। অতঃপর নমরুদ একদিন প্রচার করলেন, তিনি খোদাকে হত্যা করবার জন্য আকাশে উঠবেন।

এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখবার জন্যে রাজ্যের চারদিক থেকে দলে দলে লোক এসে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে লাগলো।

যথাসময়ে জলচৌকির চারটা খুঁটির সঙ্গে শকুন চারটাকে বেঁধে মুখের খানিকটা ওপরে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। নমরুদ দু'জন সঙ্গী নিয়ে সেই চৌকির ওপরে গিয়ে বসলেন। শকুনগুলো মাংসের লোভে উড়তে সুরু করলে।

উড়তে উড়তে মেঘলোক পার হয়ে আরো ওপরে—আরো ওপরে—এত ওপরে উঠলো যে পৃথিবীকে একটা ধোঁয়ার মতো মনে হতে লাগলো। নমরুদ নীচের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন; যদি দড়ি ছিঁড়ে জলচৌকিটা পড়ে যায়—কী যে দশা ঘটবে ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু সঙ্গী দু'জনকে তাঁর ভয়ের কথা তিনি গোপন করলেন, বললেনঃ আমরা তবে এবারে ইব্‌রাহিমের খোদার রাজ্যে এসেছি। শুনেছি তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। তা, নাই বা গেলো—চারদিকেই তীর ছুঁড়ি—যেখানেই থাকে, দফা ঠাণ্ডা হবে। এই বলে তিনি চারদিকে তীর ছুঁড়্‌তে সুরু করলেন।

খোদাতা'লা স্বর্গদূত জিবরাইলকে বললেনঃ নমরুদ অনেক আশা করে আমাকে বধ করতে এসেছে;—যে আমার

নিকটে যা চেয়েছে আমি তাকে তা দিয়েছি। তুমি নমরুদের তীরগুলো ধরে প্রত্যেক ফলকের আগায় মাছের রক্ত মাখিয়ে নমরুদকে ফিরিয়ে দাও। তাকে নিরাশ কোরো না।

খোদার আদেশ মতো স্বর্গদূত জিবরাইল মৎস্যের নিকটে রক্ত চাইতে গেলো। মৎস্য বললে ঃ খোদা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, একজন ধর্ম্মদ্রোহীর জন্য রক্ত দিতে আমি স্বীকৃত নই।

জিবরাইল বললেন ঃ তুমি রক্তদান করো দয়ালু খোদা তার প্রতিদানে এই সুযোগ তোমাকে প্রদান করবেন, কোনো পশু জীবিতাবস্থায় বধ না করলে মানবগণ তার মাংস আহার করবে না, কিন্তু তুমি জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থাতেই মানবের ভক্ষ্য হবে।

চিংড়ী বেলে ইত্যাদি মৎস্য আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে রক্তদান করলে। সেদিন হতে তাদের দেহ এখন অবধি রক্তহীন, তোমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে।

নমরুদের চৌকির ওপরে রক্তমাখা তীর এসে পড়তে লাগলো। তীরের অগ্রভাগে রক্ত দেখে আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর শত্রু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খোদা তবে মারা পড়েছেন! যাক্—এতদিনে নিষ্কণ্টক হওয়া গেলো!

নমরুদ নীচে নামবার জন্যে মাংসের টুক্‌রোগুলো শকুনির মুখের নীচে ঘুরিয়ে দিলেন। শকুনিগুলো শাঁ-শাঁ শব্দে পৃথিবীর দিকে দ্রুতবেগে নেমে এলো।

নমরুদ মাটিতে নেমে রক্তমাখা তীরগুলো সমবেত প্রজাদের দেখিয়ে বললেনঃ ইব্‌রাহিমের খোদাকে আমি হত্যা করে এসেছি। এই দেখ, তীরের আগায় তাঁর দেহের রক্ত।

সকলে একবাক্যে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ইব্‌রাহিমও সেই জনতার মধ্যে ছিলেন। তিনি নমরুদের সুমুখে এগিয়ে এলেন, বললেনঃ খোদাকে কেহ কখনো হত্যা করতে পারে না।

নমরুদ খুশীভরা কণ্ঠে বললেনঃ মূর্খ ইব্‌রাহিম, বিশ্বাস কর—এইমাত্র তাঁকে বধ করে আমি ফিরছি। তোর বিশ্বাস না হয়—তাঁকে ডেকে দ্যাখ্—তিনি কেমন করে তোর কাছে আসেন দেখি।

ইব্‌রাহিম জবাব দিলেনঃ তাঁকে কোথাও যেতে আসতে হয় না—তিনি সব জায়গাতেই সব সময়ে রয়েছেন।

নমরুদ বললেনঃ বিশ্বাস করলি না ইব্‌রাহিম? তোর খোদা যদি জীবিতই থাকেন তবে তাঁকে বল্ সৈন্যসামন্ত যোগাড় করতে—আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

ইব্‌রাহিম প্রত্যুত্তর করলেনঃ তাঁর সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, আপনিই বরঞ্চ প্রস্তুত হোন। যখনই বলবেন তখনই তিনি রাজী।

এ কথায় নমরুদ মনে মনে ভীত হলেন—সত্যই কি তবে ইব্‌রাহিমের খোদা মারা যান নি!

সেইদিন হতে নমরুদ সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। বহু নূতন সৈন্য নিযুক্ত হতে লাগলো। নমরুদ তাঁর অধীন রাজন্যবর্গের নিকটে সৈন্য চেয়ে পাঠালেন—অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ সেনা সংগৃহীত হয়ে গেলো।

ইব্‌রাহিম খোদার নিকটে আবেদন জানালেন: হে নিখিলপতি, হে সর্ব্বশক্তিমান, একজন সামান্য মানব আজ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি তাকে সাজা দিয়ে সমগ্র ধর্ম্মদ্রোহীকে বুঝিয়ে দাও, তোমার বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তারা তোমার রোষ থেকে ক্ষমা পায় না। হে দয়াল, তুমি যদি তাদের ক্ষমা করো তবে তোমাকে যে কেউ মানতে চাইবে না প্রভু! তাকে শাস্তি দেবার জন্যে আমাকেও সাহায্য করো।

এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে দৈববাণী শুনতে পাওয়া গেলো: কিরূপ শাস্তি তুমি পছন্দ করো—কি সাহায্য তুমি চাও?

ইব্‌রাহিম বললেন: তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে নূতন করে কি বলবো প্রভু! তবে আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার সৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র এবং অতি দুর্ব্বল প্রাণী দিয়ে নমরুদের সৈন্যদের হত্যা করো। ধর্ম্মদ্রোহীরা বুঝুক, তোমার লীলা কত বিচিত্র—কত রহস্যময়!

পুনরায় দৈববাণী হলো: তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

এদিকে নমরুদ ইব্‌রাহিমকে যথাসময়ে সংবাদ পাঠালেন—তাঁর সৈন্য প্রস্তুত; এবারে তিনি খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছা করেন।

এই সংবাদ শুনে ইব্‌রাহিম নির্দ্দিষ্ট দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে নমরুদের সৈন্যেরা যেখানে খোদার প্রেরিত সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিলো, সেই স্থানে এলেন। নমরুদকে ডেকে বললেন ঃ খোদার সৈন্য এবারে যুদ্ধে আসছে—আপনারা প্রস্তুত হোন।

নমরুদ এবং তাঁর সৈন্যেরা চেয়ে দেখলে, দূরে 'কাফ' পর্ব্বতের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র—সেই ছিদ্র হতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মশা ভন্‌-ভন্‌ শব্দে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে উড়ে আসতে সুরু করেছে।

নমরুদ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন ; বললেন ঃ ইব্‌রাহিম্‌, পালে পালে মশা আসছে দেখতে পাচ্ছি।—ঐ কি তোমার খোদার সৈন্য ?

ইব্‌রাহিম জবাব দিলেন ঃ ওরাই খোদার সৈন্য, ওদের অস্ত্রই আপনার সৈন্যগণ আগে সহ্য করুক—পরে অন্যরূপ ব্যবস্থা হবে। নমরুদ অবজ্ঞাভরে বললেন ঃ তবে যুদ্ধ আরম্ভ হোক।

তাঁর আদেশ পেয়ে সৈন্যদলে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো।

অমনি মশারা নমরুদের লোক-লস্করের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক একটি মশা এক একজন সৈন্যের নাকের ছিদ্রপথে মস্তকে প্রবেশ করে এমন বিষম কামড় দিতে আরম্ভ করলে যে, তারা যন্ত্রণায় নাচতে সুরু করলো। বেদনা সহ্য করতে না পেরে হাতের গদা দিয়ে পরস্পর পরস্পরের মাথায়

আঘাত করতে লাগলো। নিদারুণ আঘাতে অনেকেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করলো।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়! দলে দলে মশা তাদের মাথার ওপরে ভন্-ভন্ করতে করতে যেতে লাগলো। একে একে সমস্ত সৈন্যের জীবনলীলা এমনি করে শেষ হলো।

বেগতিক দেখে নমরুদও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে যাচ্ছিলেন—সুরুৎ করে একটা মশা তাঁর নাকের মধ্যে প্রবেশ করলো। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি প্রাসাদের দিকে ছুটে চললেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনি হেকিমকে হুকুম করলেন মস্তক থেকে মশা বের করে দিতে। শত রকমের ওষুধ—সহস্র প্রকারের প্রক্রিয়া—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মশার কামড়ের যন্ত্রণায় প্রাণ যায় আর কি! নমরুদ কাতর হয়ে পড়লেন। একজন প্রহরীকে মাথায় কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে আঘাত করতে হুকুম করলেন। আঘাত করতে কিছু যেন আরাম বোধ হলো বলে মনে করলেন। সুতরাং এই উপায়েই রোগের চিকিৎসা চলতে লাগলো। যতক্ষণ আঘাত করা যায় ততক্ষণ মশাটা চুপ করে থাকে; আঘাত বন্ধ হলেই মশাটা কামড়াতে সুরু করে।

এই ভাবে দিন কাটতে লাগলো। আহার নেই—শয়ন নেই—নিদ্রা নেই—অবিরাম চিকিৎসা চলতে লাগলো।

এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে ইব্‌রাহিম একদিন এসে নমরুদকে বললেন ঃ সম্রাট্ নমরুদ, আপনি করুণাময় খোদার নিকটে আপনার কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি পরম দয়ালু—আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আপনি এই দারুণ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবেন।

নমরুদ ইব্‌রাহিমের কথা গ্রাহ্য মাত্র করলেন না, বললেন ঃ চল্লিশ দিন তো সামান্য—যতদিন জীবন আছে ততদিন যদি এমনি কষ্ট ভোগ করি তথাপি তোর খোদার কাছে ক্ষমা চাইবো না—তোর খোদাকে মানবো না।

ইব্‌রাহিম বললেন ঃ আপনি খোদাকে মানেন না বটে, কিন্তু আপনার ঘরবাড়ী আসবাবপত্র যা আপনি দেখছেন সকলেই তাঁর স্তুতি করে।

নমরুদ অত্যন্ত সবল কণ্ঠে বললেন ঃ কখনো নয়।

ইব্‌রাহিম বললেন ঃ শুনুন তবে।

তন্মুহূর্ত্তে প্রাসাদের চারদিক থেকে শব্দ হতে লাগলো ঃ খোদা এক এবং অদ্বিতীয়, ইব্‌রাহিম তাঁর বন্ধু।

নমরুদ বললেন ঃ ইব্‌রাহিম, তুমি যাদু জানো ?

ইব্‌রাহিম জবাব দিলেন ঃ সকল যাদুর যিনি অধিপতি—এসব তাঁর দ্বারাই সম্ভব।

নমরুদ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আদেশ করলেন ঃ এই প্রাসাদ, এই আসবাবপত্র—এই বেবিলন পুড়িয়ে দাও।

প্রহরীরা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু নমরূদ পুনরায় গর্জ্জন করে উঠতেই তারা সহরের চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিলে। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করলো।

নমরূদ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল অগ্নির দিকে চেয়ে রইলো।

ইব্‌রাহিম বললেন : বেবিলন পুড়ে গেল বটে, কিন্তু আপনার গায়ের জামা, আপনার হাত-পা সবাই তো খোদাকে মানে।

নমরূদ শুনতে পেলেন, সত্যই তার দেহের বস্ত্রখণ্ড হতে—পদযুগল হতে শব্দ উত্থিত হচ্ছে : খোদা এক এবং অদ্বিতীয়—ইব্‌রাহিম তাঁর বন্ধু।

নমরূদ জামাটা খুলে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিলেন। কোষ থেকে তরবারি মুক্ত করে আঘাত করতেই দেহ থেকে পা দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে লাফাতে লাগলো। তবু পাপাচারী নমরূদের মুখে খোদার নাম উচ্চারিত হলো না।

ইব্‌রাহিম অনুরোধ করলেন : এখনো আপনি খোদার শরণ নিন্; তিনি আপনাকে শান্তি দেবেন।

নমরূদের জিদ অত্যন্ত প্রবল, বিকৃতকণ্ঠে বললেন : ও-সব বুজ্‌রুকি আমার কাছে চলবে না।

কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্যের দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। তাঁর দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান বাতাসে মিশে গেলো।

বিবি হাজেরা কাঁদে দূর মরু ময়দানে,
ইব্‌রাহিম খলিলুল্লা তাঁরে ত্যাজে কোন্ প্রাণে !

সারা ও হাজেরা বিবি সতীন দুইজন,
হাজেরাকে ইব্‌রাহিম দেন নির্ব্বাসন ;
মরু আরবের ময়দানে একা কাঁদিছে হায় !
কোলে শিশু কাঁদে—এক ফোঁটা জল দাও তায়

ধূ ধূ বালু—জল হায় নাহি কোনো খানে ।

'জল কোথা—জল দাও' বলি ফুকারে নারী ;
পিপাসায় প্রাণ বাহিরায়—কোথায় বারি।
দেহ পুড়ে যায় সাহারার 'লু' হাওয়ায়
আগুন ঢালিছে রোদ, প্রাণ বুঝি যায়—
থৈ-থৈ জ্বলে বালু—বালুর সাগর,
মরীচিকা মনে হয় ওই সরোবর ;
অভাগী ছুটিয়া যায় জলের সন্ধানে।

নয়নে অশ্রু নেই—দেহ ফেটে লহু বুঝি ঝরে,
এক ফোঁটা জল দাও—জল দাও—কলিজা বিদরে।
শিশু ইস্‌মাইল পড়ে মাটিতে লুটায়
হাত-পা ছুঁড়িয়া বালক খেলা করে তায়,
পায়ের আঘাতে তার জমিন ফাটিয়া
জলের ঝরণা-ধারা আসে বাহিরিয়া,
হাজেরা শোকর করে খোদা মেহেরবানে।

হাজেরা বিবি সেই 'আবে জম্‌জম্' পান করে প্রাণ বাঁচালেন।

হযরত ইব্‌রাহিম একবার ভ্রমণ করতে বেরিয়ে নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে হারাম দেশে এসে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে কিছুদিন বাস করবার পরে সারা খাতুনকে বিবাহ করবার তাঁর সুযোগ ঘটে। আরো কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে তিনি

মিশর রাজ্যে গিয়ে সেখানকার সুলতানের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সম্রাট্ তাঁর সৌজন্য ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে অতিশয় আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর ধর্ম্মালোচনায় মুগ্ধ হয়ে একান্ত অনুগত হয়ে পড়লেন। কিছুকাল থাকবার পর ইব্‌রাহিম মিশর ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে সম্রাট্ তাঁকে বহু ধনরত্ন পারিতোষিক প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে একটি পবিত্র-চরিত্রা রূপবতী বাঁদীও তাঁকে উপহার দেন। সেই বাঁদীটির নাম বিবি হাজেরা। হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে নানা দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে তিনি প্যালেষ্টাইনে এসে উপনীত হলেন।

সারা খাতুনের কোনো সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করলো না। প্রতিবেশীরা মনে ভাবলেন, তিনি বন্ধ্যা। হযরত ইব্‌রাহিম পুত্রমুখ না দেখতে পেয়ে মনের কষ্টে দিন কাটান। তাঁকে সর্ব্বদা অতিশয় ম্লান দেখাতো। স্বামীর দুঃখ বুঝতে পেরে সারা খাতুন চিন্তা করলেন, তাঁর নিজের গর্ভে তো সন্তানাদি হলো না। হাজেরার সহিত স্বামীর বিবাহ দিলে, তাতে হয়তো সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে।

কথাটা তিনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে স্বামীর নিকট ব্যক্ত করলেন। হযরত ইব্‌রাহিম অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। অনেক দ্বিধার পর তিনি সারা খাতুনকে খুশী করবার অভিপ্রায়ে অবশেষে স্বীকৃত হলেন। এক শুভক্ষণে ইব্‌রাহিম বিবি

হাজেরার পাণিগ্রহণ করলেন, এবং সন্তান কামনা করে খোদাতা'লার অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন।

ভক্তের প্রার্থনা কখনও বিফলে যায় না। খোদাতা'লা তাঁর আরজ মঞ্জুর করলেন। যথাসময়ে ইব্‌রাহিমের একটি চাঁদের মতো শিশু জন্মগ্রহণ করলো। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ পুরী আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে উঠলো। শিশুটির নাম রাখা হলো ইস্‌মাইল।

নারীর মন অতি বিচিত্র। যে সন্তানের জন্য সারা খাতুন স্বেচ্ছায় সপত্নী গ্রহণ করলেন, চাঁদের মতো সেই সন্তানকে দেখে তাঁর মনে হিংসার উদ্রেক হলো! ক্রমে এমন অবস্থা তাঁর হলো যে, সতীন ও সতীনের পুত্রকে কিছুতেই তিনি আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। এক বাড়ীতে নিজের চোখের সম্মুখে সপত্নী ও সপত্নী-পুত্রকে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। তিনি হযরত ইব্‌রাহিমকে সর্ব্বদা সারা খাতুনের দুর্নাম শোনাতে লাগলেন এবং তাঁদের পরিত্যাগ করবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু ইব্‌রাহিম তাঁর অন্যায় আবদার রক্ষা করলেন না।

কিন্তু ভাগ্য যাদের অপ্রসন্ন দুঃখ তাদের সইতেই হয়। শেষ অবধি হাজেরাও খোদার রোষ থেকে রক্ষা পেলেন না। আল্লাহ্‌তা'লা ইব্‌রাহিমকে হাজেরা ও তাঁর পুত্রকে নির্ব্বাসিত করবার জন্য আদেশ করলেন। তখন তিনি

নিরুপায় হয়ে পত্নী এবং পুত্রকে মক্কা নগরীর নিকটে এক মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন, তারপর অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে হাজেরাকে বললেন ঃ খোদার হুকুমে তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। এই বলে তিনি এক মশক জল ও কিছু খেজুর তাঁকে দিয়ে চলে গেলেন। কিছু দূরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে খোদা, তোমারই হুকুমে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে এস্থানে রেখে যাচ্ছি। তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্তা প্রভু; এরা যেন কোন বিপদে না পড়ে, তুমিই এদেরে রক্ষা কোরো।

কিছুদিন পরে খাদ্য এবং পানীয় নিঃশেষ হয়ে এলো। জননীর বুকের দুধের ধারাও ক্ষীণ হয়ে গেলো। শিশু ইস্‌মাইল ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চীৎকার করতে লাগলো। হাজেরা নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের ওপরে উঠে জলাশয়ের সন্ধান করতে লাগলেন। নিরাশ হয়ে অপর একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে নিকটে কোন জনমানবের বসতি আছে কিনা লক্ষ্য করতে লাগলেন, এবং মনে মনে খোদার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে লাগলেন। বারে বারে নিরাশ হয়েও বেচারী হাজেরা একবার সম্মুখে ও একবার পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও জলের সন্ধান তিনি পেলেন না।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো শিশু ইস্‌মাইলের পায়ের আঘাতে পাথরের টুকরা সরে গিয়ে একটা ছোট গর্ত্ত হয়েছে ও

তার মধ্য থেকে ক্ষীণ জলের ধারা ধীরে ধীরে বের হচ্ছে। তিনি পরম দয়াবান খোদাতা'লাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রাণ ভরে জলপান করলেন এবং শিশুর মুখে দিলেন।

ঝরণার চারধারে বিবি হাজেরা বাঁধ দিয়ে দিলেন, ফলে সেটা একটা সুমিষ্ট পানীয় জলের কূপ তৈরী হলো, ঐ কূপ চার হাজার বৎসর ধরে লোককে পানীয় যুগিয়ে আজও হযরত হাজেরার মাতৃ-হৃদয়ের আকুল প্রার্থনার সাক্ষ্য দান করছে। ক্রমে ক্রমে ঐস্থানে লোকের বসতি হয়ে সুবিখ্যাত মক্কা নগরী তৈরী হয়েছে।

সেই সময়ে সদোম নগরীর লোকেরা খোদাতা'লার বিধি-নিষেধ না মেনে নানা রকম কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। হযরত লুত তাদের সৎপথে আনবার এবং ধর্ম্মপথে চালাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। লুতের সদুপদেশ তাদের একেবারেই ভাল লাগলো না।

খোদাতা'লা কয়েকজন ফেরেশ্‌তাকে সদোম নগরী ধ্বংস করবার জন্য প্রেরণ করলেন।

ফেরেশ্‌তারা প্রথমে হযরত ইব্‌রাহিমের নিকট উপস্থিত হলেন। ইব্‌রাহিম তাঁদের যথোচিত সমাদরের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু ফেরেশ্‌তারা কিছুই আহার করলেন না, কারণ তাঁরা

সমস্ত আহার-বিহারের অতীত। ইব্‌রাহিম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা নিজেদের পরিচয় প্রদান করে বললেনঃ সদোম নগরী ধ্বংস করবার জন্য খোদাতা'লা কর্ত্তৃক তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন; কারণ ঐ নগরের লোকেরা নানারূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ফেরেশ্‌তারা সারা খাতুনকে বললেন যে, শীঘ্রই তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইস্‌হাক, এবং সেই পুত্রের পুত্র হলে তাঁর নাম হবে ইয়াকুব।

কিন্তু সারা খাতুন তাঁদের কথায় সন্দিহান হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে কি করে তাঁর পুত্র হওয়া সম্ভব। ফেরেশ্‌তারা বললেনঃ খোদাতা'লার কৃপায় সকলই সম্ভব।

হযরত ইব্‌রাহিম সদোম নগরীর ধ্বংস অনিবার্য্য জেনে পাপী লোকদের জন্য খোদাতা'লার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁকে জানালেন যে, সদোম নগরীর লোকদের পাপের মাত্রা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সেই নগরীর ধ্বংস কিছুতেই নিবারিত হবে না।

ফেরেশ্‌তারা হযরত লুতের নিকটেও অতিথির ছদ্মবেশে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকেও সদোম নগরীর ধ্বংস সম্পর্কে আল্লার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন এবং বললেনঃ তুমি অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে অদ্য রাত্রেই এস্থান পরিত্যাগ কর; নইলে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। কারণ খোদাতা'লার রোষ

শীঘ্রই এই লোকদের ওপর পতিত হবে, এমন কি তোমার স্ত্রীও সে গজব থেকে রক্ষা পাবে না।

হযরত লুত সেই রাত্রেই সদোম নগরী পরিত্যাগ করলেন। রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্পে সেই বিশাল নগরী, বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুল দম্ভ এবং অগণিত নরনারীসহ চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বক্ষ হতে বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

ইব্‌রাহিম খলিলুল্লা খোদার প্রিয়জন
কোর্‌বানি দেন ইস্‌মাইলে—সন্তান আপন।
এক রাত্রে তিনি খোয়াব দেখলেন
খোদা যেন তাঁকে হুকুম করছেন :
'ইয়া ইব্‌রাহিম কোর্‌বানি দে—কোর্‌বানি দে।'
(তিনি) তিনি ভোরে উঠে শত উট কর্‌লেন্ জবেহ্।
ভাবলেন খোদার আদেশ হলো সমাপন।

পরের রাতে স্বপ্ন দেখেন—হুকুম আল্লার
'প্রাণের চেয়ে প্রিয় যাহা কোর্বানি দিস্ তার।'
প্রাণের চেয়ে প্রিয়! সে তো অপর কেহ নয়
পুত্র কেবল ইস্মাইল জবিউল্লাহ্ হয়।
ইস্মাইলে সঙ্গে নিয়ে ময়দানেতে যান
তাঁরে তিনি বধ করিবেন এ কথা জানান;
শহীদ হবে শুনে পুত্র অতি খুশী হন।

ছুরি হাতে ইব্রাহিম বেঁধে নিলেন আঁখি
হয়তো মমতা হবে (খোদার কাজে) আসতে পারে
ফাঁকি.
চোখ বেঁধে তাই ছুরি চালান পুত্রের গলায়
দেহ হতে মাথা কেটে ভূমিতে লুটায়।
চোখ খুলে চেয়ে দেখেন পুত্র বেঁচে আছে
তার বদলে (এক) দুম্বা জবেহ্ করিয়াছে;
ঈমান পরীক্ষা হলো—ধন্য হলো সে পাক জীবন।

বিবি হাজেরাকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু হযরত ইব্রাহিম সারা খাতুনের অনুমতি গ্রহণ করে মক্কা নগরীতে মাঝে মাঝে এসে স্ত্রী ও পুত্র ইস্মাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতেন।

একদিন ইব্রাহিম স্বপ্নে দেখতে পেলেন, খোদাতা'লা যেন তাঁকে কোর্বানি করবার জন্যে হুকুম করছেন। পরদিন

আল্লাহের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি একশত উট ও দুম্বা কোর্‌বানি করলেন। কিন্তু এ সত্বেও সেইদিন রাত্রে তিনি পুনরায় খোদাতা'লার আদেশ পেলেন যে, তাঁকে পুনর্ব্বার কোর্‌বানি করতে হবে। তিনি সে হুকুমও পালন করলেন। কিন্তু অতিশয় তাজ্জবের কথা, খোদা তাঁর সে কোর্‌বানি গ্রহণ করলেন না। পরের রাত্রে তিনি পুনরায় খোয়াব দেখলেন, খোদা তাঁকে যেন হুকুম করছেনঃ হে ইব্‌রাহিম, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আমার উদ্দেশে কোর্‌বানি কর।

ইব্‌রাহিম বিশেষ বিপদে পতিত হলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কি? ধন-ঐশ্বর্য্য বিষয়-সম্পত্তি—এ সকল তো প্রিয়। স্ত্রী এদের চেয়ে প্রিয়। স্ত্রী অপেক্ষা আপনার প্রাণ অধিক প্রিয়। জগতে সকলের চেয়ে প্রিয়তম তাঁর পুত্র। নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হলো। তিনি ভাবলেন, খোদাতা'লা সম্ভবতঃ তাঁর পুত্রকেই কোর্‌বানিরূপে চাইছেন। উত্তম, তাই হবে। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! অনেক পুণ্যে ইব্‌রাহিমকে এই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। খোদার অনুগ্রহ থাকলে নিশ্চয়ই এই হৃদয়-দ্বন্দ্ব এবং ঈমান পরীক্ষায় তিনি জয়ী হতে পারবেন। সঙ্কল্প স্থির করে হযরত ইব্‌রাহিম পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দূরবর্ত্তী পাহাড়ের নিকটে গেলেন এবং ইস্‌মাইলকে খোদার আদেশ জ্ঞাপন করলেন। ইস্‌মাইল পিতার কথা শুনে আপনার জীবন বলি

দিতে সানন্দে স্বীকৃত হলেন ; বললেন : আব্বা, খোদা আমার জীবন দিয়েছেন, তিনিই যখন গ্রহণ করতে চাচ্ছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র কোর্‌বানি করুন।

ইব্‌রাহিম মনকে দৃঢ় করে বস্ত্রের মধ্যে থেকে ছুরিকা বের করলেন। তীক্ষ্ণধার অস্ত্র প্রখর রৌদ্রে ঝল্‌সে উঠলো। একখানা রুমাল দিয়ে তিনি পুত্রের চোখ বেঁধে দিলেন এবং জবেহ্‌ করতে মনে মমতার সঞ্চার হতে পারে ভেবে অপর একখানি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আপনার চক্ষু আবৃত করলেন। তারপর দৃঢ়হস্তে ইস্‌মাইলের গলায় ছুরিকা চালালেন।

কার্য্য সমাপ্ত করে চোখের বন্ধন তিনি মুক্ত করলেন। কি আশ্চর্য্য, খোদার এমনি মর্‌তবা, পুত্র ইস্‌মাইল অক্ষত দেহে সম্মুখে দাঁড়িয়ে—তার পরিবর্ত্তে একটি দুম্বা জবেহ্‌ হয়ে ভূমিতলে পড়ে আছে !

এমন সময়ে গায়েবী আওয়াজ (দৈববাণী) শুনতে পাওয়া গেলো : ইব্‌রাহিম, তোমার কোর্‌বানি পূর্ণ হয়েছে। পুত্রকে জবেহ্‌ করবার আর প্রয়োজন নেই।

খোদার অসীম করুণায় পিতাপুত্রের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেলো।

পূর্ব্বে খোদাতা'লার উপাসনার জন্য কোন মস্‌জিদ বা গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিলো না। খোদার আদেশে হযরত ইব্‌রাহিম সর্ব্বপ্রথম মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ শুধু তিনি ও তাঁর পুত্র ইস্‌মাইল দু'জনে করেছেন। হযরত ইস্‌মাইল পাথর তুলে দিতেন ও হযরত ইব্‌রাহিম দেওয়াল গাঁথতেন। এইরূপে পিতাপুত্র কাবার দেওয়াল নির্ম্মাণ করেন। হযরত ইব্‌রাহিম কাবার ছাদ নির্ম্মাণ করেন নি।

কাবা নির্ম্মাণ করতে বহুদিন সময় লেগেছিলো,—এত বেশী দিন লেগেছিলো যে, হযরত ইব্‌রাহিম যে পাথরের ওপরে

দাঁড়িয়ে কাজ করতেন, তার ওপরে তাঁর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে। আজও পর্য্যন্ত পাথরখানি আছে। হাজীরা কাবা প্রদক্ষিণের পূর্ব্বে ঐ স্থানে নামাজ পড়ে থাকেন। ওর নাম মকামে ইব্রাহিম।

কাবাগৃহ নির্ম্মাণ শেষ হলে হযরত ইব্রাহিম প্রার্থনা করেছিলেনঃ হে পরোয়ার দিগার (পালনকর্ত্তা), আমরা পিতাপুত্রে পরিশ্রম করে যে গৃহ নির্ম্মাণ করলাম, হে প্রভু, তুমি তা গ্রহণ করো। হে সর্ব্বশক্তিমান, আমরা ও আমাদের বংশধরেরা যেন তোমার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারি।

আমাদের বংশধরগণের জন্য তাঁদের মধ্য থেকেই তুমি এমন মহামানব পাঠাও, যাঁরা তোমার বাণী সকলকে শোনাবেন, যাঁরা সবাইকে জ্ঞানবুদ্ধি দেবেন।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন।

তিনি পুনরায় প্রার্থনা করলেনঃ হে প্রভু, এই স্থানে শান্তি দাও ও সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর কর। হে দয়াময়, আমি তোমার এই পবিত্র গৃহের নিকটে আমার বংশধরগণের জন্য বাসস্থান মনোনীত করলাম। এ স্থান যেন শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে। শেষ বিচারের দিনে তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, আমার বংশধরগণকে এবং তোমাতে যাঁরা বিশ্বাসী তাদেরকে ক্ষমা কোরো।

বৃদ্ধ বয়সে বিবি সারা খাতুনের গর্ভে হযরত ইব্‌রাহিমের এক পুত্রসন্তান জন্মে। তাঁর নাম ইস্‌রাইল (আঃ)। ইস্‌রাইলের দুই পুত্র ইয়াশা ও ইয়াকুব। ইয়াকুবের বারোটি পুত্র, তন্মধ্যে একাদশ পুত্র হযরত ইউসুফ। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বনি-ইয়ামিন।

হযরত ইয়াকুব জানতেন যে, ইউসুফ ভবিষ্যৎ জীবনে নবী হবেন। তিনি অতি গুণবান, শ্রী ও লাবণ্যমণ্ডিত ছিলেন। শৈশবেই ইউসুফ ও বনি-ইয়ামিন মাতৃহীন হন; নানা কারণে হযরত ইয়াকুব অন্যান্য সন্তানের অপেক্ষা

ইউসুফকে একটু বেশী আদর-যত্ন করতেন। এই জন্য বিমাতার গর্ভের অপর দশজন ভ্রাতা ইউসুফকে একটু ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখতো।

ইউসুফ একদা রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেলেন—সূর্য্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র তাঁকে যেন অভিবাদন করছে। পরদিন পিতার নিকটে কথাটা বললেন। ইয়াকুব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন: তোমার পিতামাতা ও এগারটি ভাইয়ের চাইতে তুমি শ্রেষ্ঠ হবে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার অপর ভ্রাতাদের নিকটে কখনো এ বিষয়ে বোলো না। কারণ তা'হলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে।

পিতার মনে আশঙ্কা ছিলো, একে তো ভাইরা ইউসুফকে হিংসার চক্ষে দেখে, তার ওপরে তারা কোনো গতিকে স্বপ্নের কথা জানতে পেরে হয়তো আরো হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সাবধানতা সত্ত্বেও ভ্রাতারা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানতে পারলে। তারা পরামর্শ করতে লাগলো, কিরূপে ইউসুফকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। অনেক যুক্তিতর্কের পর তারা স্থির করলে, তাঁকে না মেরে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। যদি ভাগ্যে থাকে, কোনো পথিকের দয়ায় তাঁর প্রাণরক্ষা হলেও হতে পারে।

এইরূপ পরামর্শ করে তারা পিতার নিকটে গিয়ে বললে : আব্বা, ইউসুফ তো এখন বড়সড় হয়েছে, ওকে আর বাড়ীতে রাতদিন না রেখে আমাদের সঙ্গে মাঠে পাঠিয়ে দিন্। সেখানে সে খেলাধূলা করবে। আমরা তাকে দেখাশুনা করবো।

হযরত ইয়াকুব প্রথমে তাদের কথায় রাজী হলেন না। কিন্তু তাদের পীড়াপীড়ি ও অনেক যুক্তিতর্কের পর অবশেষে তাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন।

পরের দিন তারা ইউসুফকে অনেক দূরে এক নির্জ্জন মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার দেহ থেকে জামাকাপড় খুলে নিয়ে তাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করলে। ইউসুফ প্রায় মরে যাবার মতন হলেন। তাদের সবচেয়ে বড় ভাই বললে : তোমরা ওকে মেরে ফেলো না। ওকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দাও।

তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে তারা কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাড়ী চলে গেলো।

বাড়ী এসে পিতার নিকট কপট দুঃখ করতে করতে জানালো : আব্বা, ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। এই দেখুন তার জামায় রক্ত। হযরত ইয়াকুব আর কি করেন। তিনি শোকে মূহ্যমান হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কয়েক দিন পরে একদল সওদাগর সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মরুভূমির পথে সঙ্গের জল প্রায় নিঃশেষ হওয়ায়

কূপ থেকে জল সংগ্রহের ইচ্ছা করে তাঁরা জল তুলতে গেলেন। সে সময় খোদার আদেশে ইউসুফ তাঁদের বালতি মধ্যে উঠে এলেন। ওদিকে তাঁর দশ ভাই তখন সেখানে ভেড়া চরাচ্ছিলো। তারা ইউসুফকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বললো ঃ কি আশ্চর্য্য, এ যে আমাদের সেই গোলাম ; কয়েক দিন থেকে পালিয়ে এসেছে। একে যদি আপনারা ক্রয় করেন তবে আমরা বিক্রী করতে পারি।

প্রতিবাদ করলে ভ্রাতারা পাছে তাকে বধ করে এই ভয়ে ইউসুফ চুপ করে রইলেন।

কয়েকটি টাকা দিয়ে সওদাগরেরা তাঁকে কিনে নিলেন। সওদাগরদের সঙ্গে ইউসুফ মিশর দেশে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তাঁকে তাঁরা বাদশাহের এক আত্মীয় কিৎফীর আজিজ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করলেন। আজিজ ইউসুফকে তাঁর স্ত্রী জুলেখার খাস গোলাম করে দিলেন।

ইউসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য রূপবান্ হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর অপরূপ শ্রী, লাবণ্য ও সুগঠিত দেহ-সৌষ্ঠবের প্রতি প্রভুপত্নী জুলেখা দিনে দিনে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। একদিন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করে তাঁকে তাঁর অনুগত হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ইউসুফ সে কথায় একেবারে কর্ণপাত মাত্র করলেন না। জুলেখা নানা

প্রকার প্রলোভন দিয়েও তাঁর মন জয় করতে পারলেন না। অবশেষে নিরাশ হয়ে তিনি স্বামীর নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।

ইউসুফ দোষারোপের প্রতিবাদ করে বললেন : এই নারীই আমাকে অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত করবার চেষ্টা করেছে।

এইরূপে একে অন্যের নামে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইউসুফ ও জুলেখার এই সকল কাহিনী ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়লো। অন্যান্য মেয়েরা ছি ছি করতে লাগলো। তারা জুলেখার দোষ দিতে লাগলো।

জুলেখা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য মেয়েরা অন্যায় আলোচনা আরম্ভ করেছে, তখন তিনি তাদের জব্দ করবার জন্য এক ফন্দী আঁটলেন। তিনি তাদের একদিন নিমন্ত্রণ করলেন এবং ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয় এমন একটি খাবার প্রস্তুত করলেন। সকলে খেতে এলে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিলেন। তারা যখন খেতে আরম্ভ করেছে ঠিক্ সেই সময়ে জুলেখা ইউসুফকে ডাকলেন। ইউসুফকে দেখে মেয়েরা এত বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো যে, তারা খাবার কাটতে গিয়ে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেললো। তারা বলাবলি করতে লাগলো : এত রূপ! এত সুন্দর! একি মানুষ না ফেরেশ্‌তা!

জুলেখা সেই সময়ে সুযোগ পেয়ে বললেন : তোমরা আমাকে দোষী করেছিলে, এবার তো তোমরাও দোষী।

নিমন্ত্রিত মহিলারা এবারে সত্য সত্যই লজ্জিত হলো।

ইউস্থফের প্রতি নারীদের এইরূপ আসক্তির কথা জানতে পেরে সমাজের মাতব্বরেরা শঙ্কিত হলেন। তাঁরা নৈতিক জীবন পবিত্র রাখবার জন্ম ইউস্থফের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন। বাদশাহ উপায়ান্তর না পেয়ে নিরপরাধ ইউস্থফের কারাবাসের হুকুম দিলেন।

ইউস্থফকে কয়েদখানায় দেওয়া হলো। তাঁর সঙ্গে আরো দুটি যুবককেও কারাগারে প্রেরণ করা হলো।

একদা রাত্রে সেই যুবক দুটি স্বপ্ন দেখলে। সেই স্বপ্নের কথা তারা ইউস্থফকে জানালো। একজন বললে, সে যেন আঙুর থেকে সুরা বের করছে।

অপর একজন বললে, সে যেন মাথা বয়ে রুটি নিয়ে যাচ্ছে। কতকগুলো পাখী সেই রুটিগুলো ঠুকরে খাচ্ছে।

ইউস্থফ খোদাতা'লার কৃপায় প্রগাঢ় তত্ত্বদর্শী হয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করে বললেনঃ দেখ, তোমাদের একজন শীঘ্র মুক্তি পাবে এবং বাদশাহের সঙ্গী নিযুক্ত হয়ে তাঁকে সরবৎ পান করাবে। অপর জনের ফাঁসী হবে এবং তার মাথা পাখীতে ঠুকরে খাবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ইউস্থফের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য সত্যই ফলে গেলো। একজন মুক্তি পেলো অপর জনের ফাঁসী হলো। যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিলো সে বাদশাহের অনুচর নিযুক্ত হলো।

কিছুদিন পরে বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, সাতটি কৃশকায় গাভী সাতটি বলবতী গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীর্ণ ধানের শীষ সাতটি সতেজ ধানের শীষকে খেয়ে ফেলছে। বাদশাহ পরদিন দরবারে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করে অনুচরদের কাছে এর অর্থ জানতে চাইলেন। কিন্তু কেহই সদুত্তর দিতে পারলে না। কারাগারের সেই যুবক সেখানে উপস্থিত ছিলো। হযরত ইউসুফের কথা তার মনে পড়ে গেলো। তখনই তাঁর কাছে গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে। ইউসুফ বললেন: প্রথমে সাত বৎসর খুব ভাল ফসল হবে। তোমরা তা থেকে যতটা পার সঞ্চয় করবে। তারপরে সাত বৎসর ভীষণ অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হবে, সে সময় তোমরা সেই সঞ্চিত শস্য থেকে খরচ করতে পারবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পেরে বাদশাহ খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং ইউসুফকে তাঁর নিকটে আনবার সঙ্কল্প করলেন।

যে সকল মেয়েরা অসাবধানতায় নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিলো, তাদের কাছে অনুসন্ধান করে বাদশাহ জানতে পারলেন, ইউসুফ তাদের সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করেন নি। তারাই ইউসুফকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো। জুলেখাও সেখানে ছিলেন। তিনি এ কথার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন।

বাদশাহ সব কথা শুনে অনুতপ্ত হলেন এবং ইউসুফকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন।

ইউসুফের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সত্য সত্যই সফল হলো। প্রথম সাত বৎসর ভাল ফসল হলো এবং পরের সাত বৎসর ভীষণ *দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো।*

মিশরের সঞ্চিত খাদ্যের কথা জানতে পেরে নানা দেশ থেকে লোকজন আসতে লাগলো। ইউসুফের ভ্রাতারাও খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে এলো। তিনি তাদের দেখে চিনতে পারলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারলে না। তিনি ভ্রাতাদের খাদ্য দিয়ে বলে দিলেন ঃ এবার যখন আসবে তখন তোমাদের ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তাকে না নিয়ে এলে খাদ্য পাবে না। এই বলে অনুচরবর্গের দ্বারা কিছু অর্থ গোপনে তাদের খাদ্যের থলির মধ্যে পূরে দিলেন।

তারা বাড়ী ফিরে গিয়ে তাদের পিতাকে মিশরে শাসনকর্ত্তার অনেক গুণের কথা বর্ণনা করলে এবং এবারে ছোট ভাইকে নিয়ে যাবার জন্য বলে দিয়েছেন সে কথাও জানালে। হযরত ইয়াকুব তাদের পূর্ব্বেকার কাজ স্মরণ করে কনিষ্ঠ পুত্র বনি-ইয়ামিন্‌কে তাঁদের সঙ্গে দিতে রাজী হলেন না।

খাদ্যের বস্তা খোলা হবার পর তার মধ্যে টাকা দেখতে পেয়ে তারা খুবই আশ্চর্য্য হলো।

পুনরায় খাদ্যাভাব ঘটলে তারা তাদের পিতাকে গিয়ে

শক্ত করে ধরলে, বললেঃ আব্বা, আপনি ছোট ভাইকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন, খোদার নামে শপথ করে বলছি, আমরা তাকে অক্ষত দেহে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

পিতা তাদের জিদের কাছে পরাজিত হয়ে অগত্যা অনুমতি দিলেন। ইয়ামিন্‌কে সঙ্গে নিয়ে তারা মিশরে গেলো এবং ইউসুফের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে সহরে প্রবেশ করলে। ইউসুফের কাছে যখন তারা পৌছালো তখন ছোট ভাইকে ডেকে নিয়ে তিনি তাঁর পরিচয় প্রদান করলেন।

অন্যবারের মতন এবারেও তাদের বস্তা বোঝাই খাদ্য দেওয়া হলো। ইউসুফের এক চাকর একটি পেয়ালা ইচ্ছা করে ছোট ভাইয়ের বস্তায় লুকিয়ে রেখে দিলে।

পেয়ালা হারিয়ে যাওয়ায় বিশেষ সোরগোল পড়ে গেলো। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বনি-ইয়ামিনের বস্তার মধ্যে সেটি পাওয়া গেলো।

বনি-ইয়ামিন্‌কে বাদশাহের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। তার ভ্রাতারা বললেনঃ আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ হয়েছেন। এটি তাঁর সকলের ছোট ছেলে। একে ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে পিতা বড়ই কষ্ট পাবেন। আপনি এর বদলে আমাদের একজনকে রাখুন।

ইউসুফ বললেনঃ তা হতে পারে না।

সকলের বড় ভাই অন্যান্য সকল ভাইকে বললেঃ তোমরা

ফিরে যাও। আমি আল্লার নামে শপথ করে পিতাকে বলে একে নিয়ে এসেছি। আমি কোন্ মুখে পিতার কাছে ফিরে যাবো! আমি ইয়ামিনের সঙ্গে এখানেই থাকবো।

তারা দেশে গিয়ে হযরত ইয়াকুবকে সমস্ত সংবাদ জানালো। তিনি শুনে দুঃসহ শোকে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন। শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, বললেনঃ দেখ, আল্লার দয়ায় আমি অনেক কিছু জানি। তোমরা আল্লার ওপর বিশ্বাস রেখে ইউসুফ ও বনি-ইয়ামিনের খোঁজ কর।

পিতার আদেশে তারা পুনরায় মিশরে গেলো এবং খাদ্য কিনতে চাইলো। সেই সময়ে ইউসুফ তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন, বললেনঃ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ক্ষমা করবেন, তিনি ক্ষমাশীল। তোমরা আমার এই জামা পিতার কাছে নিয়ে যাও, তা' হলে তিনি সব জানতে পারবেন।

আল্লার কৃপায় ইয়াকুব সমস্ত জানতে পারলেন। ইউসুফের ভাইরা ফিরে এসে তাঁর জামাটা পিতাকে দিলেন। হযরত ইয়াকুব খুশী হয়ে বললেনঃ পূর্ব্বেই বলেছি, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

ইউসুফের পরামর্শ মতো তাঁর ভ্রাতারা পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে মিশরে গেলেন। সেখানে ইউসুফ তাঁদের বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অনেকদিন আগেকার কথা। আরব দেশে সাদ নামে একটি বংশ ছিলো। এই বংশের লোকদের চেহারা ছিলো যেমন খুব ভীষণ লম্বা এবং চওড়া, গায়েও ছিলো তেমন শক্তি। তারাই ছিলো তখন আরব দেশে প্রবল এবং প্রধান।

তাদের একজন বাদশাহ ছিলো—তার নাম শাদ্দাদ। শাদ্দাদ ছিলো সাত মুলুকের বাদশাহ। তার ধনদৌলতের সীমা ছিলো না। হাজার হাজার সিন্দুকে ভরা ছিলো মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ। পিলখানায় লক্ষ লক্ষ হাতী, আস্তাবলে অসংখ্য ঘোড়া। সিপাইশান্ত্রী যে কত তার লেখাজোকা ছিলো না।

উজীর-নাজীর, পাত্র-মিত্র, আমলা-গোমস্তায় তার রঙ্‌মহল দিনরাত গম্ গম্ করতো।

সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত যদি একটু বেশী থাকে, সে তবে একটু অহঙ্কারী হয়ই। শাদ্দাদ বাদশাহের দেমাগ এত বেশী হয়েছিলো যে, একদিন সে দরবারে বসে উজীর-নাজীরদের ডেকে সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে বললেঃ দেখ, আমার যে রকম খুবসুরৎ চেহারা, তাতে আমি কি খোদা হ'বার উপযুক্ত নই?

উজীর-নাজীরেরা তাকে তোষামোদ করে বললেঃ নিশ্চয়ই! এত যার ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, উজীর-নাজীর, দালান-কোঠা হাতী-ঘোড়া, তিনি যদি খোদা না হ'ন তবে আর খোদা হবার উপযুক্ত এ দুনিয়ায় কে? এত সিন্দুক ভরা মণিমুক্তা হীরা-জহরৎ, এত হাতী-ঘোড়া, আর দরবার ভরা আমাদের মতো উজীর-নাজীর খোদা তার চৌদ্দপুরুষেও দেখে নি। সুতরাং আপনিই আমাদের খোদা।

আরব দেশের লোকেরা সে সময়ে গাছ, পাথর প্রভৃতি পূজা করতো। শাদ্দাদ কিন্তু এটা মোটেই পছন্দ করতো না। সে হুকুম জারি করলোঃ কেহ ইট পাথর বা অন্য মূর্ত্তি পূজা করতে পারবে না, তার বদলে সম্রাট্ শাদ্দাদকে সকলের পূজা করতে হবে।

সাত মুলুকের বাদশাহ শাদ্দাদ, তার ওপরে কথা বলে এমন সাধ্য কারো নেই। সুতরাং তার হুকুমমত কাজ চলতে লাগলো।

একদিন হুদ নামক একজন পয়গম্বর তার দরবারে এসে হাজির হলেন। পয়গম্বরেরা খোদার খুব প্রিয়। তাঁরা নবাব বাদশাহদের ভয় করতে যাবেন কেন? হুদ পয়গম্বর তাকে বললেনঃ তুমি নাকি খোদার ওপর খোদকারী করবার চেষ্টা করছ? তোমার এ দুঃসাহস কেন? পরকালের ভয় যদি থাকে, তবে আল্লাহ্‌তা'লার 'পরে ঈমান আন।

হুদ নবীর দুঃসাহস দেখে দরবারের সকলে অবাক। উজীর-নাজীর, পাত্র-মিত্র যার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত—স্বয়ং বেগম সাহেবা যার কথার ওপর কথা বলতে পারেন না, সামান্য একজন দরবেশ কিনা তাকে দিচ্ছে উপদেশ! এত বাচালতা! ক্রোধে শাদ্দাদের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। মেঘ-গর্জ্জনের মতো হুঙ্কার দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলেঃ মূর্খ ফকির, তোমার খোদাকে মানতে যাবো কিসের জন্য?

হুদ নবী বললেনঃ তিনি পরম মঙ্গলময়। তিনি দুনিয়াতে তোমাকে সুখে রাখবেন এবং মৃত্যুর পর তোমায় বেহেশ্‌তে থাকতে দেবেন।

শাদ্দাদের ওষ্ঠে এইবার ক্রোধের পরিবর্ত্তে হাসি ফুটে উঠলো, বললেঃ তোমার খোদা কি আমার থেকেও বেশী সুখী?

হুদ হেসে জবাব দিলেনঃ নিশ্চয়ই। কিন্তু দুনিয়া ছেড়ে দিলেও বেহেশ্‌ত, বেহেশ্‌তের অতুলনীয় শোভা, অনন্ত

শান্তি, অফুরন্ত সুখ, চাঁদের মত খুবসুরৎ হুরী তো তুমি ভোগ করতে পাবে না।

শাদ্দাদ অবজ্ঞা ভরে হো-হো করে হেসে উঠলো, বললে : রেখে দাও তোমার খোদার বেহেশ্‌তের কাহিনী! অমন আজগুবি গল্প ঢের ঢের শুনেছি।

হুদ বললেন : আজগুবি নয়—সত্যি সত্যিই। খোদার এমন অপরূপ বেহেশ্‌ত কি তোমার পছন্দ হয় না?

শাদ্দাদ জবাব দিলে : হবে না কেন—এমন আজব বেহেশ্‌ত কার অপছন্দ বল? কিন্তু তাই বলে তোমার খোদার পায়ে আমি মাথা ঠুকতে যাবো কেন? আমি কি তোমার খোদার বেহেশ্‌তের মতো বেহেশ্‌ত তৈরী করতে পারি না!

হুদ বললেন : জাহাঁপনা, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে এমন কথা বলতে না। খোদা যা করতে পারেন তা মানবের সাধ্যাতীত।

শাদ্দাদ সহাস্যে বললে : মূর্খেরা এমন কল্পনাই করে বটে। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই পারবো, তোমার খোদার চেয়ে আমার টাকা-পয়সা, লোক-লস্করের কিছু অভাব আছে নাকি? আমি দেখিয়ে দেবো, তোমার খোদার বেহেশ্‌ত থেকে আমার বেহেশ্‌ত কত বেশী সুন্দর।

শাদ্দাদের কথা শুনে হুদ ভয়ানক রেগে গেলেন,

বললেন ঃ মূর্খ বাদশাহ, এত স্পর্দ্ধা তোমার ! শীঘ্রই দেখতে পাবে, এত অহঙ্কার কিছুতেই খোদা সহ্য করবেন না।

শাদ্দাদ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে উঠলে ঃ কে আছ ! এই ভিখারীটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।

হুদ নবী অপমানিত হয়ে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরের কথা। বদ্‌খেয়ালী শাদ্দাদ তার তাঁবেদার বাদশাদের ফরমান জারী করে জানালে ঃ খোদার বেহেশ্‌তের চেয়ে বেশী সুন্দর করে অপর একটি বেহেশ্‌ত আমি সৃষ্টি করতে সঙ্কল্প করেছি। সুতরাং উপযুক্ত জায়গার সন্ধান কর।

হুকুম মাত্র জায়গা তল্লাসের ধূম পড়ে গেলো, অনেক খোঁজাখুঁজির পর আরব দেশের এয়মন স্থানটি সকলের পছন্দ হলো। ইহা লম্বায় আট হাজার মাইল আর চওড়ায় ছিলো পাঁচ হাজার মাইল।

বেহেশ্‌তের উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেছে শুনে শাদ্দাদ খুশী হলো। তারপর সে হুকুম জারি করলো যে, সাত মুলুকে যে সব হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ আছে সব এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। বাদশাহের হুকুম কেউ অমান্য করতে সাহস করলে না। দেখতে দেখতে সমস্ত হীরা, মণি, পান্না, জহরৎ এয়মন মুলুকে জমা হতে লাগলো।

দুনিয়ার যেখানে যত সুন্দর ও মূল্যবান জিনিষ ছিলো

বেহেশ্‌ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তার প্রত্যেকটি আনা হতে লাগলো। নানা বর্ণের মর্ম্মর, জমরদ, ইয়াকুত ও মার্ব্বেল জোগার করা হলো। লক্ষ লক্ষ মজুর ও কারিগর কাজ করতে আরম্ভ করলে। দিনরাত পরিশ্রম করে তিনশত বছর ধরে যে বেহেশ্‌ত রচনা করা হলো তা সত্য সত্যই বিচিত্র কারুকার্য্যময় ও অপূর্ব্ব চমকপ্রদ হয়েছিলো।

এই বেহেশ্‌তের যে দিকে নজর দেওয়া যায় সেই দিকেই অপরূপ। তার চারদিকে শ্বেত পাথরের দেয়াল ও থাম, তাতে কুশলী শিল্পীদের চমকদার কারুকার্য্য দেখলে, চোখ জুড়িয়ে যায়। দেয়ালের গায়ে নানা রঙের ইয়াকুত পাথর দিয়ে এমন সুন্দর লতা-পাতা ও ফুল তৈরী করা হয়েছে যে, ভ্রমর ও মৌমাছিরা জীবন্ত মনে করে তার ওপরে এসে বসে। রঙ্‌মহলের চারপাশে হাজার ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, কিন্তু তাতে বাতির দরকার হয় না। অন্ধকার রাত্রেও সেই ঘরগুলো চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল।

মহলের ধারেই বসবার ঘর ও হাওয়াখানা। মণিমুক্তা-খচিত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পাথরের কৌচও মেঝে সজ্জিত রয়েছে। মেঝের ওপরে নানা রঙের নানা আকারের সুন্দর সুন্দর ফুলদানী, তাতে সাজানো রয়েছে জমরদ ও ইয়াকুত পাথরের নানা রকমের ফুলের তোড়া। তা থেকে আতর গোলাব মেশক ও জাফ্‌রাণের খোশবু ছুটছে।

মহলের চার পাশে বাগান। বাগানে সোণা-রূপার গাছ। তার পাতা ফল ফুল নানা বর্ণের পাথর দিয়ে তৈরী। ভ্রমর ও মৌমাছিগুলো এমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত যে, দেখলেই মনে হবে যে তারা বুঝি সত্য সত্যই ফুলের ওপর বসে মধু পান করছে। সেই সব ফুল ফল থেকে যে সৌরভ বের হচ্ছে তাতে আকাশ বাতাস চারদিক ভুর্ ভুর্ করছে।

এই সব গাছের নীচ দিয়ে কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছে গোলাপ-জলের নহর। তার জল এত স্বচ্ছ যে, মনে হয় তরল মুক্তার ধারা বয়ে যাচ্ছে। সেই নহরের ধারে ধারে হীরা মণিমুক্তার বাঁধানো ঘাট। সেখানে চুণিপান্নার তৈরী শত শত সুন্দরীরা যেন স্নান করছে।

তারপরেই নাচঘর। কোনো ঘরে ওস্তাদেরা হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে গান করছে—বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, কোন ঘরে বা কিন্নরকণ্ঠী সুন্দরী বালিকারা তালে তালে নাচছে এবং গান গাইছে। এরাই শাদ্দাদের বেহেশ্‌তের হুরী। নানা দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এদের এখানে জমায়েত করা হয়েছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নাচছে চাঁদের মতো খুবসুরৎ হাজার হাজার কচি কচি বালক।

অনিন্দ্যসুন্দর করে বেহেশ্‌ত নির্ম্মাণ করা হয়ে গেলে, শাদ্দাদকে সংবাদ দেওয়া হলো। সে তখন অধীন নবাব বাদশাদিগকে হুকুম জারি করে জানিয়ে দিলে, তারা যেন

শীঘ্রই শাদ্দাদের সহিত মিলিত হয়,—তাদের সঙ্গে নিয়ে সে তার বেহেশ্‌ত দেখতে যাবে। প্রজাগণকে নিজের পয়সা খরচ করে আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্য হুকুম দেওয়া হলো। বাদশার হুকুম মেনে তারা নাচ-গান করতে লাগলো, এবং হরদম বাজী পোড়াতে লাগলো।

এক শুভদিনে সুন্দর সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে পাত্রমিত্র, উজীর-নাজীর, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, দামামা বাজাতে বাজাতে হাজার হাজার ঘোড়ার খুরের ধূলায় আশ্‌মান অন্ধকার করে শাদ্দাদ বাদশাহ তার সৃষ্ট বেহেশ্‌ত দেখতে চললো।

গল্পগুজব করতে করতে তারা এগিয়ে চললো। দূর থেকে নজর পড়লো বেহেশ্‌তের একটা অংশ। এত চমকপ্রদ, এত জমকালো যে, চোখ ঝলসে যেতে লাগলো। আনন্দে তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। তারপর একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো ঃ ঐ আমার বেহেশ্‌ত। ঐ বেহেশ্‌তের সিংহাসনে আমি খোদা হয়ে বসবো, আর তোমরা হবে আমার ফেরেশ্‌তা। হুরীরা যখন হাত-পা নেড়ে নাচবে আর গাইবে তখন কি মজাই না হবে !

উজীর নাজীর ওমরাহ্‌গণ তার কথায় সায় দিয়ে তোষামোদ করে তাকে খুশী করতে লাগলো। এমনি করতে করতে তারা বেহেশ্‌তের দরজায় এসে হাজির হলো। বাদশাহ

সকলের আগে আগে যাচ্ছিল। সে বেহেশ্‌তের দ্বারদেশে একটি রূপবান যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো। তার সুন্দর চেহারা দেখে খুশী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো: তুমি কি এই বেহেশ্‌তের দরোয়ান ?

যুবক উত্তর করলো: আমি মালাকুল্‌ মওৎ।

শাদ্দাদ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো: তার মানে ?

যুবক উত্তর করলো: আমি আজ্‌রাইল। তোমার প্রাণ বের করে নিয়ে যাবার জন্য খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন।

শাদ্দাদ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। চীৎকার করে বললো: আমার সঙ্গে তামাসা! কে আছিস্‌? বলে অন্যের প্রতীক্ষা না করে নিজেই খাপ থেকে তরবারি বের করে যুবককে কাটতে অগ্রসর হলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তার হাত উঁচু হয়েই রইল। উত্তেজনায় শরীর দিয়ে দরদর ধারায় ঘাম নির্গত হতে লাগলো। চীৎকার করে বললো: সৈন্যগণ, এই শয়তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলো।

যুবক অট্টহাসি হেসে প্রশ্ন করলে: কই তোমার সৈন্য-সামন্ত ?

শাদ্দাদ পিছন ফিরে দেখে তার লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভয়ে সে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো! তারপর হতাশ স্বরে বললে: সত্যই কি তুমি আজ্‌রাইল ?

আজ্‌রাইল বললেঃ হাঁ! দেরী করবার ফুরসুৎ আমার নেই। আমি এখনই তোমার প্রাণ বের করে নেবো।

শাদ্দাদ চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলো। সে শিশুর মতো নিঃসহায় ভাবে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো। হাত জোড় করে বললেঃ একটু সময় আমাকে দাও ভাই আজ্‌রাইল। অনেক সাধ করে আমি বেহেশ্‌ত তৈরী করেছি, একটিবার আমায় তা দেখতে দাও। এই বলে সে ঘোড়া থেকে নামবার চেষ্টা করলো।

মেঘের মতন গর্জ্জন করে আজ্‌রাইল বললেঃ খবরদার, এক পা এগিয়ে আসবে না।

শাদ্দাদ হাউ মাউ করতে সুরু করে দিলো। সেই অবস্থাতেই আজ্‌রাইল তার প্রাণ বের করে নিয়ে চলে গেলো।

তারপর কি হলো?

হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শাদ্দাদ বাদশাহের অতি সাধের বেহেশ্‌ত তার শ্রী, ঐশ্বর্য্য, লোক লস্কর, উজীর, নাজীর, পাত্রমিত্র সব কিছু নিয়ে হু হু করে মাটির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। দুনিয়ার ওপরে তার আর কোন চিহ্নই রইলো না। শুধু মানুষের মনে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে রইলো আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কারের শাস্তি কিরূপ ভয়ঙ্কর!

অনেকদিন আগের কথা। একদিন হযরত ইসা সিরিয়ার পথে যেতে যেতে একটা মানুষের মাথার খুলি পড়ে রয়েছে দেখতে পেলেন। সেই খুলিটার সঙ্গে কথা বলবার জন্য তাঁর খেয়াল হলো। তিনি তখনই খোদার দরগায় আরজ করলেন: হে প্রভু, আমাকে এই খুলির সঙ্গে কথা বলবার শক্তি দাও।

খোদা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

হযরত ইসা খুলিকে বললেন: হে অপরিচিত কঙ্কাল, তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করবো, তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে ইসা শুনতে পেলেন, পরিষ্কার ভাষায় সেই খুলিটা কলমা শাহাদত পাঠ করলো।

ইসা জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি পুরুষ না স্ত্রী?

খুলি উত্তর করলো: পুরুষ।

ইসা বললেন: তোমার নাম কি?

খুলি উত্তর করলো: জম্‌জম্‌।

ইসা আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আগে কি ছিলে?

খুলি উত্তর করলো: আমি আগে বাদশাহ ছিলাম।

ইসা বললেন: বটে! তোমার জীবনে কি কি কাজ করেছিলে?

খুলি উত্তর করলে: আমি আগে একজন বাদশাহ ছিলাম। ধনদৌলৎ লোকলস্কর আমার এত বেশী ছিলো যে, দুনিয়ার বাদশারা তা দেখে অবাক হয়ে যেতো। তারা আমাকে খুব ভয় আর সম্মান করতো। আমি কিন্তু কারো ওপর কোনো অত্যাচার করতাম না। গরীব-দুঃখীদের সাধ্যমতো দান করতাম। সমস্ত দিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু ভুলেও কখন খোদার নাম মুখে আনতাম না। এমনি করে অনেক দিন আমি বাদশাহী করেছিলাম। একদিন দরবারে বসে কাজ করছি এমন সময়ে হঠাৎ আমার মাথা ব্যথা হলো। যন্ত্রণা ক্রমে বাড়তে লাগলো, আর বসতে পারলাম না।

রঙ্‌মহলে চলে গেলাম। সেবা-শুশ্রূষা চলতে লাগলো। কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠলো। যেখানে যত বড় হেকিম ছিলো, চিকিৎসার জন্য তাদের সকলকে ডাকা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা আওয়াজ আমার কাণে ঢুকলো। কে যেন চীৎকার করে বলছে: জম্‌জমের প্রাণ বের করে দোজখে ফেলে দাও। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট মূর্ত্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। উঃ, কি ভীষণ তার চেহারা! দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর কি হলো আমার মনে নেই। যখন আবার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম আমার প্রাণ নিয়ে যাবার জন্য আজ্‌রাইল একা আসে নি। তার সঙ্গে আরও অনেক ফেরেশ্‌তা এসেছে। তাদের কারও হাতে লোহার ডাণ্ডা, কারও হাতে শিক্‌, কারও হাতে তরোয়াল। সমস্তই আগুনে পোড়ান জবাফুলের মতো রাঙা। তারা সেই সমস্ত দিয়ে আমাকে সেঁকা ও খোঁচা দিতে লাগলো। আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করে তাদের বলতে লাগলাম: ওগো, তোমরা এমনি করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় মেরো না। আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভাণ্ডারে যত ধন-দৌলৎ হীরা-জহরৎ আছে সব তোমাদেরে দেবো। এই কথা শুনে তাদের মধ্যে থেকে একজন লোহার মতো শক্ত

হাতে আমার গালে একটা চাপড় দিয়ে বললে : রে নাদান্! খোদা কারও ধনদৌলতের পরোয়া করে না।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতর ভাবে তাদের কাছে মিনতি করে বললাম : ওগো, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও। তার বদলে আমার বংশের প্রত্যেক লোককে আমি খোদার নামে কোর্বানি করবো। এই কথা বলেই তাদের দয়ার ভিখারী হয়ে কাতর নয়নে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। তারা দাঁত কড়মড় করে ধমক দিয়ে বললে : রে বেয়াদব, খোদা কি ঘুষখোর ?

আজ্রাইল তখন ফেরেশ্তাদের বললেন : আর দেরী কোরো না ; এখনই এর প্রাণ বের করে দোজখে ফেলে দাও।

তারপর তারা আমার প্রাণ বার করে নিয়ে গেলো।

তারপর কি হলো আর আমার জানবার ক্ষমতা রইলো না। হঠাৎ মনে হলো, যেন আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ খুললাম। আমি কোথায় আছি প্রথমে বুঝতেই পারলাম না! অন্ধকার, চারদিকে ঘন অন্ধকার ; আলো নেই—বাতাস নেই! এই অবস্থা আমার অসহ্য হয়ে উঠলো, ক্রমে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আর সেই কবরের মধ্যে যেন হাজার ফেরেশ্তা এক সঙ্গে চীৎকার করে বলছে : রে নাদান, আমরা তোর প্রাণ বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম, পুনরায় তোর দেহের মধ্যে প্রাণ দিয়েছি। এখন এই কাফনের কাপড়ের উপর লেখ, দুনিয়ায় তুই কি কি কাজ করেছিস্।

জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যা যা করেছি সব আমার মনে স্পষ্ট জাগতে লাগলো। আমি এক এক করে অল্প সময়ের মধ্যে সব লিখে ফেললাম।

তারপর ফেরেশ্‌তারা ভয়ানক গর্জ্জন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: বল, তোর খোদা কে?

আমি ভয়ে ভয়ে উত্তর করলাম: তোমরাই আমার খোদা। আমি অন্য খোদা জানি না। তোমরা আমাকে রক্ষা করো।

এই কথা শুনে তারা ভয়ানক রেগে গেলো। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আমাকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করলো। তারপর মনে হতে লাগলো, কবরের মাটি চারদিক থেকে যেন আমাকে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্রমে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। মাটি চীৎকার করে বলতে লাগলে: রে বেইমান, শত শত বৎসর আমার পিঠের উপর বাদশাহী করে কত অত্যাচার করেছিস্, আর খোদার না-ফর্‌মানী করেছিস্; তাই তোর এই শাস্তি। এই কথা বলে মাটি আমার হাড়গুলোকে গুঁড়ো করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অসহ্য যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্‌ করছি, এমন সময়ে কতকগুলো ভীষণ মূর্ত্তি জীব আমাকে ধরে আরো ওপরে নিয়ে গেলো। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম খোদা বুঝি মেহেরবাণী করে আমাকে মাফ করবেন; কিন্তু সে ভরসা শূন্যে মিলিয়ে গেলো, যখন দেখলাম, তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলো

আর একজন লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বিকট চেহারার লোকের কাছে। সে লোকটা ভীষণ চীৎকার করে বলে উঠলো : এই কম্‌বখ্‌ত্‌কে (হতভাগ্যকে) আগুনের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো, তারপর পায়ের দিক থেকে উল্টো করে চামড়া ছাড়িয়ে ফেলো।

তারা তখনই প্রভুর হুকুম তামিল করতে আরম্ভ করলে; আমাকে পচা দুর্গন্ধময় একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলো।

ক্ষুধায়, পিপাসায় আর অসহ্য যন্ত্রণায় যেন হৃদপিণ্ড দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো। আমি কাতর ভাবে তাদের বললাম : দোহাই তোমাদের, আমাকে এক পাত্র জল দাও।

ফেরেশ্‌তারা কিসের রস এনে আমাকে খেতে দিলো। চোখ বুজে সেই রস মুখের মধ্যে ঢেলে দিলাম। উঃ, কি বিশ্রী দুর্গন্ধ! মনে হতে লাগলো, এ জিনিষ না খাওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিলো। চীৎকার করে বলতে লাগলাম : কে আছ, আমায় এক পাত্র জল দাও, পিপাসায় প্রাণ যায়।

সেই কাতরোক্তি শুনে একজন ফেরশ্‌তা এক গেলাস জল নিয়ে এলো। মনে ভরসা হলো, এইবার বুঝি বেঁচে গেলাম। চোখ বুজে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করলাম। উঃ, এ যে আরও কটু এবং দুর্গন্ধ! সমগ্র অন্তরটা জ্বলে যেতে লাগলো। নাক, মুখ, চোখ, কাণ, এমন কি লোমের গোড়া দিয়ে পর্য্যন্ত যেন পচা দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো। আমি চীৎকার করে বলতে লাগলাম : তোমরা এমন তিল তিল করে যাতনা দিয়ে

আমাকে না মেরে যা করবার একবারেই করে ফেলো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

তারা কেহ আমার কথা গ্রাহ্য তো করলেই না, বরং আমার সেই অবস্থা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলে। আমি যতই যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগলাম, ততই তারা হো-হো করে হাসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে একজন ভীষণদর্শন ব্যক্তি আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। তার ভয়াবহ আকৃতি দেখে আমার বুক শুকিয়ে যেতে লাগলো। সে তার বিষ-মাখান লম্বা নখে আমাকে গেঁথে শূন্যে তুলে সোকরাৎ নামক এক পাহাড়ে নিয়ে গেলো। সেই পাহাড়ে সাতটা কূপ। প্রত্যেক কূপ থেকে বিষাক্ত গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। প্রত্যেক কূপে হাজার হাজার বিষাক্ত সাপ ও বিছা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করছে আর তাদের মুখের বিষ-নিঃশ্বাসে এই সমস্ত ধূম নির্গত হচ্ছে। ফেরেশ্‌তারা আমায় চুলে ধরে সেই কূপের মধ্যে ফেলে দিলো। সাপ বিচ্ছুরা চারদিক থেকে আমাকে কামড়াতে আরম্ভ করে দিলে। বিষের জ্বালায় চীৎকার করতে লাগলাম।

তারপর তারা আমাকে এক পুকুরের কাছে নিয়ে গেলো। সে পুকুরে জল নেই। শুধু পুঁজ, রক্ত ও বিষে ভরা সেই পুকুর। আমার চুলে ধরে সেই পুকুরের মধ্যে জোর করে তারা ডুবিয়ে রাখলো। যতই ওপরে উঠবার চেষ্টা করি, ততই তারা জোর করে আমাকে চেপে ধরে রাখতে লাগলো।

এই রকম করে এক কূপ থেকে আর এক কূপে এবং এক পুকুর থেকে আর এক পুকুরে হাজার বার ডুবিয়ে হাজার বার তুলে একশ' বছর ধরে আমাকে কষ্ট দিলে।

তারপর আজ হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন কাকে বলছে যে পথে হযরত ইসা যাচ্ছেন, সেই পথে জম্‌জম্‌কে দোজখ থেকে তুলে ফেলে দাও। ছুনিয়াতে সে অনেক ভাল কাজও করেছিলো। অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেছিলো। সে আজ তার পুরস্কার পাবে। সে খোদার নাম একবারও মুখে আনে নি বলে যে পাপ করেছিলো, তার শাস্তি পুরামাত্রায় ভোগ করবার পর আবার ছুনিয়াতে যাবে।

ইসা জিজ্ঞাসা করলেন: জম্‌জম্‌, তুমি আমার কাছে কি চাও?

জম্‌জম্‌ বললে: তুমি খোদার কাছে এই প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।

ইসা ছুই হাত তুলে জম্‌জমের জন্য খোদার কাছে আরজ করলেন। তারপর বললেন: জম্‌জমের হাড় মাংস সমস্ত একত্র হয়ে সে পুনর্জীবন লাভ করুক।

বলতে না বলতে একটি সুদর্শন যুবক মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইসাকে সেলাম করলো।

তোমরা হয় তো জান মাটির নীচে সোনা, রূপা, হীরা, মণি মাণিকের খনি এবং সমুদ্রের নীচে ইয়াকুত্, জমরদ, প্রবাল ও মুক্তা অনেক আছে। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, এই সবই আগে একজন মাত্র লোকের সম্পত্তি ছিলো।

এত বড় ধনী পৃথিবীতে আর একজনও ছিলো না এবং আর কেহ কখনো হবে না। তার সেই ধনসম্পত্তি তুনিয়াময় কিরূপে ছড়িয়ে পড়লো এবং ভূগর্ভে ও সমুদ্রের মধ্যে কেমন করে প্রবেশ করলো সেই আজব কাহিনী আজ তোমাদের কাছে বলবো।

হযরত মুসার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় এক খুল্লতাত পুত্র—নাম ছিলো তার কারূণ। কারূণের বরাত ছিলো খুব ভাল। তুনিয়ার সব জায়গায় তার মালগুদাম ছিলো। সমস্ত নদীতে ও সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে তার নৌকা ও জাহাজ চলাফেরা করতো। পৃথিবীর সকল সওদাগরের সে ছিলো একমাত্র মহাজন, সুতরাং সমস্ত কাজ-কারবারের সে ছিলো একেবারে মূল। নিজেও কারবার করে সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করতো এবং সওদাগরীর মুনাফা থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তার আয় হতো।

হযরত মুসা তাকে খুব ভালবাসতেন। তাকে আদর করে মাটি দিয়ে সোনা তৈরী করবার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সব নানা ব্যাপারে চারদিক থেকে কত টাকা যে তার আয় হতো তার লেখাজোকা ছিলো না। এই সব টাকার বদলে সে হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ, চুনী, পান্না, ইয়াকুত, জমরদ জোগাড় করে লক্ষ লক্ষ সিন্দুক বোঝাই করে রাখতো। সেই সমস্ত সিন্দুকের চাবি একটা মজবুত সিন্দুকে রেখে সেই সিন্দুকের চাবি দড়িতে বেঁধে নিজের কোমরে সর্ব্বদা ঝুলিয়ে রাখতো। সারা দিনরাতের মধ্যে তাকে বড় একটা কেউ বাইরে দেখতে পেতো না। চাবি হাতে করে সে প্রত্যেক দিন গুদামে গুদামে ঘুরে বেড়াতো। তোমরা হয়তো ভাবছো, এত যার টাকাকড়ি ধন-দৌলৎ সে নিশ্চয় খুব বিলাসী এবং ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলো। কিন্তু বিলাস বা সখ তার বিন্দুমাত্র ছিলো না। একটা ছিন্ন ময়লা

তালি যুক্ত পায়জামা এবং গায়ে একটা জামা ও পায়ে একজোড়া চটি জুতা ছিলো তার বেশ। ছেঁড়া চাটাই পেতে মাটিতে শুয়ে সে রাত্রি কাটাতো। দু' একখানি শুক্‌নো রুটী, কিছু খেজুর ও কয়েক পাত্র জল ছিলো তার সারাদিনের আহার্য্য। কথিত আছে, কিছুদিন পরে তাও নাকি সে গ্রহণ করতো না। একখানি মাত্র রুটী এক পাত্র জলে ডুবিয়ে সেই জল মাত্র পান করে জীবন ধারণ করতো, তারপর সেই রুটীটি শুকিয়ে তুলে রাখতো। আত্মীয় বন্ধু তাকে বলতো: তোমার তো এতো ধন-দৌলৎ, তুমি মিছামিছি এত কষ্ট করো কেন? তুমি একজোড়া ভাল জুতা কিংবা একটা জামাও কিনতে পার না?

কারূণ হেসে বলতো: বা! তোমরা তো আমাকে বেশ পরামর্শ দিচ্ছো! ক'টা পয়সা বা আমি সিন্ধুকে বাক্সে তুলেছি যে, তোমরা আমাকে ধনী ধনী বলে ঠাট্টা করছো। এখন আমিরী করে ঐ ক'টি পয়সা যদি খরচ করে ফেলি তবে বুড়ো বয়সে ছেলেপুলে নিয়ে উপোষ করলে দেবে কে বল? তোমরা আমাকে পথে বসাবার বেশ ফন্দী করেছ দেখছি?

উপদেশ-দাতারা এই কথা শুনে অবাক হয়ে চলে যেতো।

মুসা একদিন বললেন: কারূণ, খোদা তোমাকে এতো ধনদৌলৎ দিয়েছেন, তার একটা সামান্য অংশ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে জাকাৎ (দান) দেওয়া তোমার উচিত। 'ধর্ম্মে নিয়ম

আছে যে, শতকরা আড়াই টাকা জাকাৎ দিতে হয়। আশা করি তুমি অন্ততঃ শতকরা এক টাকাও জাকাৎ দেবে।

কারূণ তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে : জাকাৎ কাকে বলে ?

মুসা বললেন : শতকরা এক টাকা গরীব-দুঃখীদিগকে দান করাকে জাকাৎ দেওয়া বলে।

অন্য কেউ যদি কারূণকে দান করার কথা বলতো তাহলে সে কি করতো বলা যায় না, কিন্তু মুসা সম্পর্কে তার বড় ভাই, কখনও তাঁর কোন কথা সে অমান্য করে নি, সুতরাং মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ থেকে জবাব দিলে : দেখতেই পাচ্ছ আমি অতি গরীব, টাকা-পয়সা কোথায় পাবো যে জাকাৎ দেবো ?

মুসা বললেন : কারূণ, এত যার ধন-দৌলৎ সে যদি গরীব হয় তবে ধনী লোক কাকে বলে ?

কারূণ প্রত্যুত্তর করলে : খেয়ে না খেয়ে, কত কষ্ট করে ক'টি পয়সাই বা জমেছে তা' যদি এখন দান-খয়রাৎ করে বসি তবে বুড়ো বয়সে খাবো কি ! ভিক্ষে করা ছাড়া তো আমার আর কোন উপায় থাকবে না। ভাই, আমাকে মাফ কর ; জাকাৎ আমি দিতে পারবো না।

মুসা বিরক্ত হয়ে বললেন : খোদা তোমাকে এত দিয়েছেন যে, তুমি যদি সারা জীবন দান করো তা হলেও তা শেষ হবে না।

কথা শুনে কারূণ হো-হো করে হেসে উঠলে। সে বললেঃ না বুঝে দান করলে রাজার রাজত্ব উড়ে যায়, আর আমার তো সামান্য ঐ ক'টা পয়সা, ও আর উড়তে কতক্ষণ !

মুসা বললেনঃ তুমি গরীব কি ধনী সে তর্ক তোমার সঙ্গে করতে আমি আসি নি। জাকাৎ দেওয়া তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য তাই তোমায় বলতে এসেছি। তুমি জাকাৎ দেবে কি না বলো ?

নিরুপায় হয়ে কারূণ তখন আমতা আমতা করে বললেঃ আচ্ছা আজ ভেবে দেখি, কাল জবাব দেবো।

কারূণের মনে আনন্দের লেশ মাত্র নাই। সমস্ত দিন তার একরূপ অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় কাটলো। কি করা যায়, মুসাকে কি জবাব সে দেবে, ভেবে চিন্তে কিছুই সে ঠিক করতে পারলো না। দিন গত হয়ে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। একটা প্রদীপ জ্বেলে কারূণ হিসাব করতে বসলো। একশত টাকায় এক টাকা, হাজার টাকায় একশত টাকা ; এক লক্ষ টাকায় হবে এক হাজার ! কারূণ আর হিসাব করতে পারলো না, তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। খানিক পরে আবার সে হিসাব করতে লাগলো, এক লক্ষ টাকায় যদি এক হাজার টাকা হয় তা হলে এক কোটী টাকায় হবে

এক লক্ষ টাকা। কারূণ পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো ঃ মুসা, তোমার উপদেশ শোনার পরিবর্ত্তে আমার বুকে ছুরি মেরে আমাকে মেরে ফেলো। এক কোটী টাকায় একলক্ষ টাকা আমায় দিতে হবে জাকাৎ! কেন? গরীব-দুঃখীরা তো টাকা রোজগার করে আমার কাছে জমা রাখে নি যে, আমাকে তাদের দান করতে হবে? আমি দেবো না, এক পয়সাও আমি দেবো না। কারূণ বালিশে মুখ গুজে চুপ করে পড়ে রইলো এবং মনে মনে মুসার মুণ্ডপাত করতে লাগলো। সে রাত্রে কারূণ আর ঘুমুতে পারলে না। হঠাৎ প্রদীপটার দিকে তার নজর পড়তেই চমকে বলে উঠলো ঃ আঃ, তেল সবটা পুড়ে গেলো দেখছি, অথচ এক পয়সাও আয় হলো না। বলে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দেওয়াল ঠেস্-দিয়ে সারারাত বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

পরদিন সকাল হতে না হতেই মুসা কারূণের বাড়ীতে এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিছু ঠিক করতে পেরেছো কি কারূণ?

কারূণ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বললে ঃ কি ঠিক করার কথা বলছো? সেই জাকাতের কথা? ঐ যাঃ, একেবারেই ভুলে গেছি। আচ্ছা, আজ তুমি যাও— কাল ঠিক তোমার কথার জবাব দেবো।

মুসা চলে গেঁলেন।

কিন্তু পরদিনও এমনি ব্যাপার। এমনি করে রোজ রোজ মিথ্যা ওজর দেখিয়ে কারুণ দিন কাটাতে লাগলো।

একদিন মুসা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ তোমার কি একটুখানি লজ্জাসরমও নেই কারুণ—রোজই টালবাহানা কর। আমি এখনই শুনতে চাই জাকাৎ দেবে কি না?

কারুণও খুব রাগের সঙ্গে জবাব দিলে ঃ তুমি কি মনে কর তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না! খেয়ে না খেয়ে, কত কষ্ট করে কিছু সঞ্চয় করেছি তা দেখে তোমাদের চোখ জ্বালা করছে। আর ফন্দি আঁটছো কেমন করে সেগুলো বার করে তোমরা লুঠপাট করে নেবে। অত বোকা আমি নই। সেটি কখনো হবে না। আমি এক পয়সাও দান-খয়রাত করবো না। তুমি যা খুশী করতে পারো।

মুসা অবাক! কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না।

আরও অনেক দিন ধরে তিনি কারুণকে উপদেশ দিলেন। এমন কি আল্লাহ্‌তা'লার গজবের ভয় পর্য্যন্ত দেখালেন, দোজখের দুঃখ, বেহেশ্‌তের সুখের কথা বললেন। কিন্তু কারুণ অটল—কিছুতেই তার মন গললো না।

এবার মুসা নিরুপায় হয়ে পড়লেন। তিনি খোদার দরগায় এই প্রার্থনা করলেন ঃ হে প্রভু, কারুণকে সৎকার্য্যে দান করাবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার সদ্‌বুদ্ধি হলো না। এখন তোমার আদেশ আমাকে জানাও।

জিব্‌রাইল খোদার আদেশ নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলেন। মুসাকে বললেনঃ মুসা! তুমি বনি-ইস্‌রাইলদের মিশর থেকে চলে যেতে বলো।

মুসা সে আদেশ পালন করলেন।

জিব্‌রাইল জানালেনঃ এখন থেকে বসুমতী তোমার আজ্ঞাধীন হলো। তার দ্বারা তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করতে পারো।

কয়েকদিন পরে মুসা পুনরায় কারূণের নিকটে এসে তাকে বললেনঃ কারূণ, তুমি সৎকার্য্যে দান কর, খোদার পথে জাকাৎ দাও, নতুবা তোমার মহা অনিষ্ট হবে।

কারূণ জবাব দিলেঃ ভাই মুসা, তোমার একথা তো অনেকদিন থেকে শুনে আসছি। কোন নতুন খবর থাকে তো বলতে পারো। বলে চলে যেতে উদ্যত হলো।

মুসা তাকে ধমক দিয়ে বললেনঃ এখনও হুঁসিয়ার।

কারূণ বললেঃ হুঁসিয়ার আগে থেকেই হয়ে আছি।

এই কথা বলতে না বলতে তার পা দুটি মাটির মধ্যে ঢুকে গেলো। ব্যাপার দেখে কারূণের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো, কিন্তু বাইরে সেভাব প্রকাশ না করে বললেঃ তুমি তো বেশ যাদু শিখেছ দেখছি। এই রকম ফন্দী ফিকির করে আমার টাকাকড়ি সব লুঠ করতে চাও নাকি?

এই কথা বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে প্রবেশ করলো। বিস্ময়ে ও ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেলো। বললে ঃ বাঃ, বেশ তো ভেল্কী শিখেছ। চালাকি করে টাকা আদায় করবে এমন কচি খোকা আমাকে পাও নি!

এবারে তার গলা পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে ডুবে গেলো।

তখন সে চীৎকার করে মুসাকে বললে ঃ তুমি কি এমনি করে আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি?

মুসা ধমক দিয়ে বললেন ঃ খবরদার, এখনও যদি খোদার নামে সৎকাজে দান কর তা হলে পরিত্রাণ পেতে পারো।

কারূণ বললে ঃ আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করে ভিক্ষে করে খাবার জন্য বেঁচে থাকতে আমি চাই নে।

সে আরও খানিকটা মাটির মধ্যে ঢুকে গেলো। তার দাড়ির হাড় ঠক করে মাটিতে এসে ঠেকলো। হাতের খানিকটা তখন অবধি বাইরে ছিলো। এইবারে কারূণ হেসে ফেললো।

মুসা রূঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি হাসছ কেন?

কারূণ জবাব দিলে ঃ যে আশায় তুমি আমাকে মারবার চেষ্টা করছো সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না। কারণ সমস্ত সিন্দুকের চাবি যে সিন্দুকে বন্ধ করা আছে; এই দেখ সেই চাবি আমার মুঠোর মধ্যে রয়েছে। দুনিয়াতে এমন কোন হাতিয়ার নেই যা দিয়ে সেই সিন্দুক কাটতে বা ভাঙ্গতে পারবে। কাজেই আমাকে মেরে কোন লাভ নেই।

মুসা বললেন: মূর্খ, গরীব-দুঃখীকে দান কর, খোদার পথে জাকাৎ দাও—তোমার জীবন রক্ষা হবে।

কারূণ কিছু জবাব দিলো না; সুধু সিন্দুকটার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

মুসা বললেন: কারূণ, তোমার কি বাঁচবার ইচ্ছা হয় না?

কারূণ মুসার দিকে চোখ না ফিরিয়েই চিৎকার করে বললে: না, একেবারেই না।

মুসা প্রশ্ন করলেন: বাঁচতে ইচ্ছা হয় না কেন?

কারূণ জবাব দিলো: কেন, জানতে চাও? আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তোমরা আমায় 'ধনী' 'ধনী' বলে পাগল করে দিতে, আর হয় তো দান-খয়রাৎ করিয়ে সমস্ত বিষয়-আশয় লুটিয়ে দিয়ে আমাকে পথে বসাতে। সুতরাং টাকা কয়টা থাকতে থাকতেই আমার মরা উচিত।

মুসা আবার বললেন: কারূণ, তোমার কি একেবারেই বাঁচতে ইচ্ছা হয় না?

এবারে কারূণ রেগে চোখ লাল করে বললে: টাকার বদলে আমি বাঁচতে চাই না।

তারপর আস্তে আস্তে তার নাক, মুখ, চোখ মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে কারূণের দালান-কোঠা, ধন-দৌলত, সিন্দুক-বাক্স সমস্তই মাটির মধ্যে চলে গেলো।

মহাপ্লাবনের পর বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। নূহের বংশ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বংশে একজন পরম ধার্ম্মিক লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নাম ইস্‌রাইল। তিনি যে দেশে বাস করতেন তার নাম কেনান। মিশরের বাদশা ফেরাউন তাঁকে মিশরে এসে বাস করবার আমন্ত্রণ করেন।

তিনি ইস্‌রাইলকে যথেষ্ট প্রীতির চক্ষে দেখতেন। ফেরাউন কালক্রমে পরলোক গমন করলে অপর একজন ফেরাউন সিংহাসনে উপবেশন করলেন। ফেরাউন কোন লোকের নাম

নয়। মিশরের বাদশাহদিগকে ফেরাউন বলা হতো, ইহা পদবী। যাহা হউক পরের এই ফেরাউন অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ফেরাউনের একজন উজীর ছিলেন। প্রথমে তিনি খুব সৎস্বভাবের লোক ছিলেন। নানা রকমে প্রজাদের উপকার করতেন।

কোন বৎসর অজন্মা হলে তিনি নানা রকম কৌশল করে প্রজাদের খাজানা মকুব করবার বা শোধ করবার ব্যবস্থা করতেন। যদি রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, তা হলে তিনি বাদশার ধনাগার থেকে কৌশলে অর্থ বের করে গরীব প্রজাদের অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করতেন। এজন্য প্রজারা তাঁকে খুব বেশী সম্মান ও ভক্তি করতো। ফেরাউন গত হলে মিশর দেশের লোকেরা তাঁকেই তাঁদের বাদশা নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু বাদশা হবার পর তাঁর মনের অবস্থা যেন আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলো। তিনি ইস্‌রাইল ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে অত্যাচার করতে আরম্ভ করলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করে তাঁর রাজ্য আরও বৃদ্ধি করলেন। চারদিক থেকে রাজস্ব ও উপঢৌকন এসে তাঁর ধনাগার পূর্ণ হতে লাগলো। সাধারণ ব্যক্তি সহসা বিত্তশালী হলে তার মনে অহঙ্কার জন্মে এবং তার নানা কুপরামর্শদাতাও জোটে। সুতরাং ফেরাউনেরও এমন হিতৈষী বন্ধুর অভাব ঘটলো না। হামান নামক একজন কূটবুদ্ধি উজীর তাঁকে দুনিয়ার বাদশাহ্ হবার স্বপ্ন

দেখাতে লাগলো। প্রজারা যাতে নীরেট মূর্খ হয়ে থাকে এবং তাঁকে খোদা বলে মান্য করে তার জন্য নানা রকম যুক্তি পরামর্শও দিতে লাগলো।

মন্ত্রী হামানের পরামর্শমত ফেরাউন সমগ্র রাজ্যের মাতব্বর প্রজাদের ডেকে একটা বড় সভা করলেন। সেই সভাতে তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, লেখাপড়া শিখে মিছামিছি সময় নষ্ট করবার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, লোকের পরমায়ু অতি অল্পকাল। এই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে জীবনের বেশীর ভাগ দিনই যদি মক্তব এবং পাঠশালায় গমনাগমন করে এবং পড়ার ভাবনা ভেবে ভেবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে আমোদ-আহ্লাদ এবং স্ফূর্ত্তি করবার অবসর পাওয়া যাবে না। সুতরাং সারা জীবন ভরে আমোদ করো—মজা করো। তা হলে মরবার সময়ে মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ আসবে না।

প্রজারা ফেরাউনের ও হামানের এই উপদেশ সানন্দে গ্রহণ করলো; এবং বংশধরদের কাউকেও আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলে।

অতঃপর হামান পাঠশালা ও মক্তব রাজ্য থেকে উঠিয়ে দিয়ে ঢাক পিটে দেশময় প্রচার করে দিলে যে, কেউ আর লেখাপড়া শিখতে পারবে না। রাজার আদেশ অমান্য করলে সবংশে তার গর্দ্দান যাবে।

প্রজারা ফেরাউনের আদেশ মতো চলতে লাগলো। লেখা-পড়া আর কেউ শিখতে চেষ্টা করলো না। সারা দেশ কিছুকালের মধ্যেই একেবারে গণ্ডমূর্খতে পূর্ণ হয়ে গেলো। মূর্খের অশেষ দোষ। কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত জ্ঞান তার থাকে না। তারা হয় কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দুনিয়ায় এমন কোনো অসৎ কাজ নেই যা মূর্খে না করতে পারে। যখন তার রাজ্যের প্রজাদের এই অবস্থা, তিনি মনে মনে হাসতে লাগলেন। তার উদ্দেশ্য এত দিনে সিদ্ধ হয়েছে। তিনি প্রত্যেককে একটা করে নিজের প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে তাকে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং উপাস্য খোদা বলে পূজা করতে হুকুম দিলেন।

নিজের ঘরে বসে যদি খোদার উপাসনা করা যায় তবে কেউ কি মস্‌জিদে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে চায়? ফেরাউনের আদেশে সকলে সন্তুষ্ট হলো। এমনি করে অনেক দিন কেটে গেলে পর একদিন তিনি প্রজাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কাকে খোদা বলে মানে?

তারা বললে, ফেরাউনের প্রতিমূর্ত্তিকেই তারা খোদা বলে মান্য করে।

সেবার অনাবৃষ্টির জন্য দেশে দারুণ অজন্মা হয়েছিলো; এমন কি নীলনদের জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিলো। প্রজারা সুযোগ পেয়ে বাদশাহকে বললো: জাহাঁপনা, আপনি যদি খোদা হন তবে আপনার খোদার মতো ক্ষমতা আমাদের একবার দেখান।

এবার বৃষ্টির অভাবে নীলনদ পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে, এবং মাঠের সমস্ত ফসল পুড়ে গেছে। আপনি নীলনদ জলে পূর্ণ করে আমাদের ফসল রক্ষা করে দেবার ব্যবস্থা করে দিন।

এবারে ফেরাউন বড় বিপদে পড়লেন। কিন্তু চতুরতার সঙ্গে তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ এ আর এমন বেশী কথা কি! আগে এ সংবাদ আমায় জানাও নি কেন? আজ আমার অনেক কাজ; আজ সময় হবে না। আগামী কাল তোমাদের নীলনদ জলে ভর্ত্তি করে দেবো। তোমরা সেই জল দিয়ে তোমাদের ফসল রক্ষা কোরো।

প্রজারা খুশী হয়ে বাড়ী চলে গেলো।

প্রজারা বিদায় হলে ফেরাউন চিন্তা করতে লাগলেন, তাই তো কি করা যায়। সারাদিন কেটে গেলো—তারপর সন্ধ্যা হয়ে এলো। চিন্তার শেষ নেই; গভীর রাত্রে একাকী ঘোড়ায় চড়ে তিনি রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সহর ছেড়ে ময়দান, ময়দান পার হয়ে গ্রাম, গ্রাম পার হয়ে এক ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিলো একটি মস্ত বড় কূপ। সেই কূপের ধারে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। তার পর একগাছা দড়ি আপনার পায়ে বাঁধলেন, সেই দড়ি একটা গাছের গোড়ায় শক্ত করে বেঁধে, তিনি সেই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। সেই দোদুল্যমান অবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ

হে দয়াময় প্রভু, তুমি অনেক পাপীর ইচ্ছা পূরণ করেছ। এক্ষণে আমি বিষম বিপদগ্রস্ত। আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর মালিক। এবারের মতো তুমি আমার মান বাঁচাও। তা না হলে আমি রাত্রি প্রভাতে আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। পরকালে তুমি আমাকে যে শাস্তি হয় দিও।

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, ওপর থেকে কে যেন বলছেন : ফেরাউন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। নীলনদ তোমার আদেশ মত চলবে।

এই দৈববাণী শুনে ফেরাউন অবাক হয়ে গেলেন। আনন্দে অধীর হয়ে কূপ থেকে উঠে রাজধানীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই প্রজারা প্রাসাদের সুমুখে এসে সমবেত হতে লাগলো। ফেরাউন তাদের সঙ্গে নিয়ে নীলনদের কাছে এসে হাজির হলেন। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললেন : নীলনদ জলে পূর্ণ হয়ে যাও।

কথা শেষ হতে না হতে শুষ্ক নদী তটভূমি প্লাবিত করে অজস্র জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। এত প্রচুর জল যে, দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র অবধি পরিপ্লুত হয়ে গেলো। প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করলে : জাহাঁপনা, জমি-জমা ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হয়ে যাবার মতো হলো। হুজুর, আমাদের জমির জল একটু কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

ফেরাউন তাদের প্রার্থনা মতো নীলনদকে আদেশ করলেন। জল কমে গেলো। প্রজারা খুশী হয়ে তাকে খোদা বলে বিশ্বাস করে গৃহে ফিরে গেলো। তারপর তারা তার প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করতে লাগলো। ইহারা কপ্‌তী শ্রেণীর লোক। কিন্তু বনি-ইস্‌রাইল নামে অপর এক শ্রেণীর লোক ছিলো, তারা তাকে কোনো ক্রমেই খোদা বলে স্বীকার করলো না। কিন্তু ফেরাউন নানারকম অসম্ভব ও আশ্চর্য্যজনক কাজ করে প্রজাদের মনে দিনে দিনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে লাগলেন যে, তিনিই প্রকৃত খোদা।

ফেরাউনের এক পোষ্যপুত্র ছিলেন, তাঁর নাম মুসা। তিনি কখনো তাঁকে খোদা বলে স্বীকারও করতেন না—মানতেনও না। মুসার জন্ম সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। মিশরে ইস্‌রাইলদের বংশ খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলো। ইস্‌রাইলগণ ফেরাউনকে অবিশ্বাস এবং উপহাস করতেন, এজন্য ফেরাউন এদের মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি নিয়ম করলেন যে, ইস্‌রাইলদের পুত্রসন্তান হলেই তাকে নীলনদের জলে ফেলে দিতে হবে। এমনিভাবে কত সন্তান যে বধ করা হলো তার সীমা সংখ্যা নেই।

একদিন ফেরাউনের কন্যা স্নান করতে এসে হঠাৎ দেখতে পেলেন, নীলনদের ধারে নলবনের মধ্যে একটা ঝুড়ি ভাসতে

ভাসতে এসে আটকে রয়েছে। সেই ঝুড়ির ঢাক্‌না খুলে দেখতে পেলেন একটি ফুট্‌ফুটে ছেলে ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, ছেলেটি ইস্‌রাইলদের। শিশুটিকে দেখে ফেরাউনের কন্যার অতিশয় মমতা হলো। তিনি একে পালন করবেন বলে ঠিক করলেন। একজন ধাত্রীও পাওয়া গেলো। তার হাতে ছেলের ভার দেওয়া হলো। ছেলেটির নাম রাখা হলো মুসা।

সেই ধাত্রী অপর কেউ নয়—মুসারই গর্ভধারিণী। কালক্রমে ছেলেটি বড় হয়ে উঠলে, তাকে ফেরাউনের কন্যার নিকটে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। মুসা মিশরীয়দের সঙ্গে রইলেন বটে, কিন্তু সব সময় তাঁর মনে হতো যেন তিনি ইস্‌রাইল। একদিন মুসা দেখলেন, একজন মিশরীয় একজন ইস্‌রাইলকে বেদম প্রহার করছে। তিনি মিশরীয় লোকটিকে হত্যা করে বালিতে পুঁতে ফেললেন।

ফেরাউনের কাছে খবর গেলো। তিনি মুসাকে হত্যা করবার হুকুম দিলেন। মুসা তখন পালিয়ে মিদিয়ান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে এক কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করলেন। তারপর মাঠে মাঠে মেষ চরিয়ে কাল কাটাতে লাগলেন।

অনেকদিন চলে যাবার পর একদিন মুসা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুণকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে এসে হাজির হলেন।

বললেন ঃ আপনি যে নিজেকে খোদা বলে প্রচার করছেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। সর্ব্বশক্তিমান খোদা ছাড়া আর কেউ মানবের উপাস্য নেই। আমি খোদার প্রেরিত পয়গম্বর।

ফেরাউন তাঁকে তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দিলেন, বললেন ঃ কেমন করে বুঝবো যে, খোদা তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি কি তার কোন প্রমাণ দিতে পারো ?

মুসা হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই লাঠি ভয়ানক এক অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেলো। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে সেই সাপ যখন এগিয়ে যেতে লাগলো, তখন তার মুখ থেকে আগুনের হল্‌কা বের হতে লাগলো। সেই আগুনে গাছপালা, মানুষ, গরু পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগলো। ফেরাউন ছুটে গিয়ে মুসার হাতে ধরে কাকুতি করে বললেন ঃ মুসা, খোদা নাকি তোমাকে লোকের মঙ্গল করবার জন্য পাঠিয়েছেন ; আর তুমি তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছো। একে নিবৃত্ত করো। মুসা অজগরের গায়ে হাত দিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হলো। তিনি তখন ফেরাউনকে বললেন ঃ আশা করি আপনি এখন অহঙ্কার ত্যাগ করে ধর্ম্মপথে আসবেন।

ফেরাউন বিবেচনা করে পরের দিন জবাব দিবেন বলে সেদিন মুসাকে যেতে বললেন।

মুসা চলে গেলেন।

ফেরাউন রঙ্‌মহলে ফিরে এসে কেমন করে মুসাকে জব্দ করা যায়, সে বিষয়ে উজীর নাজীরদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। উজীর হামান অতিশয় কুচক্রী এবং কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ফেরাউনকে বুঝিয়ে দিলেন, মুসা একজন প্রথম শ্রেণীর যাদুকর এবং অতিশয় ধাপ্পাবাজ ব্যক্তি। তাকে জব্দ করবার একমাত্র কৌশল রাজ্যের যত বড় বড় যাদুকর আছে তাদের সকলকে তলব করে এখানে আনতে হবে। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির কাছে হার মেনে মুসা এখান থেকে পালিয়ে গেলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

সুতরাং হামানের পরামর্শানুযায়ী কাজ আরম্ভ হলো। রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত ছোট বড় যাদুকর ছিলো তাদের আনবার জন্য লোক পাঠানো হলো। তারা যথাসময়ে রাজধানীতে এসে হাজির হলো।

কার কত ক্ষমতা তাহা দেখাবার জন্য দিন স্থির হলো। ফেরাউনের আহ্বানে মুসাও এলেন। একজন যাদুকর মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো, অমনি চারদিক থেকে হাজার হাজার সাপ, বিছা, ভীমরুল সৃষ্টি হয়ে নানা রকম শব্দ করতে করতে মুসার দিকে ছুটে যেতে লাগলো। অপর একজন যাদুকর মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলো, অমনি শত শত সিংহ, ব্যাঘ্র চারদিক থেকে ভীষণ গর্জ্জন করে মুসার দিকে এগিয়ে গেলো।

মুসা বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে তাঁর লাঠি মাটিতে রেখে দিতেই অমনি এক ভয়ানক অজগর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করে উঠলো। চক্ষের পলকে সে যাতুকরদের সেই সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছা টপ-টপ করে গিলে ফেললো। তারপর ধরলো যাতুকরদের। তাদেরও গলাধঃকরণ করে ফেরাউনের দিকে এগিয়ে গেলো। ফেরাউন সেখান থেকে ছুটে রঙ্‌মহলে পালিয়ে প্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ করে দিলে।

এই ঘটনার পরে কিছুদিন কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন মুসা ফেরাউনের দরবারে এসে পুনরায় তাঁকে ধর্ম্মকথা শোনাতে লাগলেন এবং ধর্ম্মপথে চলবার জন্য তাঁকে উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

আল্লাহ্‌তা'লা একদা স্বপ্নে মুসাকে বনি-ইস্‌রাইলদিগকে পাপের ভূমি, অধর্ম্মের রাজত্ব মিশর থেকে তাদের পিতৃভূমি কেনান দেশে ফিরে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। সেই হুকুম অনুসারে মুসা ফেরাউনের কাছে ইস্‌রাইলদের কেনান দেশে যাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ফেরাউন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাদের মিশর ত্যাগ করতে দিলেন না, বরং তাদের প্রতি অযথা অত্যাচার করতে লাগলেন।

ইস্‌রাইলদিগকে ফেরাউনের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করবার কোন উপায় না পেয়ে মুসা খোদার নিকটে প্রার্থনা

করতে লাগলেন। খোদা তখন তাঁকে মিশরীয়দের উপর অত্যাচার করবার হুকুম দিলেন। মুসা ও তাঁর ভ্রাতা হারুণ মিশরীয়দের উপর নূতন নূতন উৎপাত করতে আরম্ভ করলেন। মুসা নদীর জলে লাঠির আঘাত করলেন, দেখতে দেখতে সমগ্র জল রক্ত হয়ে গেলো। নদীর সমস্ত মাছ মরে পচে গেলো। লোকের এতটুকু জল পান করবার কিছুমাত্র উপায় রইলো না। ইস্‌রাইলদের মিশর ত্যাগের অনুমতি প্রদানের জন্য মুসা পুনরায় ফেরাউনকে অনুরোধ করলেন। ফেরাউন বললেন ঃ নদীর জল শুধরে দাও, আমি সে বিষয় বিবেচনা করবো।

মুসা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। কিন্তু কয়েকদিন ঘুরিয়েও ফেরাউন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। মুসা ক্রুদ্ধ হয়ে জলের দিকে লাঠি ছুঁড়ে দিলেন, অমনি দলে দলে ভেক মিশর ভূমি ছেয়ে ফেললো। ফেরাউন মুসাকে ব্যাঙের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন, মুসা এবারেও ক্ষমা করলেন।

ব্যাঙের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ফেরাউন প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলো। মুসাও পুনরায় তাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করলেন। উকুনের উৎপাত সুরু হলো; তারপর মাছির উৎপাত, পশুর মড়ক—একের পর এক আসতে লাগলো। এমন কি সকলের গায়ে ভীষণ ফোঁড়া হলো, দেশে শিলাবৃষ্টি হয়ে গেলো, পঙ্গপাল এসে সব ফসল নষ্ট করে দিলো, তারপর

একবার তিন দিন চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে থাকলো যে, কোনদিকে কারো নজর করবার উপায় রইলো না।

মুসা আবার ফেরাউনকে অনুরোধ করলেন যে, এখনও ইস্‌রাইলদিগকে মিশর ছেড়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হোক। যদি তাদের ছেড়ে দেওয়া না হয়, তা হলে মিশরীয়দের ওপরে য়ে ভীষণ অত্যাচার হবে তার তুলনায় বর্ত্তমানের অত্যাচার অতি নগণ্য। ফেরাউনকে বারবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথায় ফেরাউন একেবারেই কর্ণপাত করলো না।

ইস্‌রাইলদিগকে উদ্ধার করবার জন্য খোদা অসন্তুষ্ট হয়ে মিশরীয়দের প্রত্যেক বাড়ীর বড় ছেলে ও বড় পশুটিকে মেরে ফেললেন। এবার ফেরাউনের বড় ভয় হলো। তিনি ইস্‌রাইলদের চলে যাবার হুকুম দিলেন।

ইস্‌রাইলরা অনুমতি পেয়ে দল বেঁধে রওনা হলেন, মুসা ও হারুণ আগে আগে চললেন। ইস্‌রাইলদের চলে যেতে দেখে হামান প্রভৃতি উজীরগণ ফেরাউনকে কুপরামর্শ দিতে লাগলো, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, নালা-নর্দ্দমা প্রভৃতি সাফ করা এবং রাজ্যের অনেক ছোট বড় কাজ যা তাদের দিয়ে জোর জবরদস্তি করে করিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো, তারা যদি চ'লে যায় তা হলে এসব কাজ কারা করবে। সুতরাং তারা যাতে মিশর ছেড়ে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা করবার জন্য ফেরাউনকে অনুরোধ করতে লাগলো। ফেরাউন চিন্তা

করে দেখলো, ইস্‌রাইলেরা চলে গেলে সত্যই কাজকর্ম্মের যথেষ্ট অসুবিধা হবে। তখন তিনি নিজে ও মিশরীয়েরা-তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন।

ইস্‌রাইলেরা ততক্ষণে লোহিত সাগরের ধারে এসে পৌঁছে গেছেন। এমন সময় তাঁরা পিছনে চেয়ে দেখতে পেলেন, ফেরাউনের অগণিত সৈন্য তাঁদের ধরতে আসছে। পিছনে এই বিপদ—সম্মুখে প্রকাণ্ড সাগর। ইস্‌রাইলগণ কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছেন না, ভয়ে তাঁরা কাঁপতে লাগলেন। এমন সময় আল্লাহ্‌তা'লা মুসাকে দৈববাণীতে আদেশ করলেন ঃ মুসা, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রের ওপরে আঘাত করো।

মুসা তাই করলেন। বিশাল সাগর অমনি দুই ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে একটি পথ করে দিলো ; সাগরের জল দুই ধারে দেওয়ালের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সেই পথ দিয়ে হারূণ আগে আগে চললেন, ইস্‌রাইলেরা নিরাপদে তাঁর পিছু পিছু ওপারে চলে গেলেন। সমস্ত লোক পার হয়ে গেলে মুসা নিজে তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেলেন।

তখনও সাগরের সেই রাস্তা তেমনি রয়ে গেলো। এর মধ্যে ফেরাউন, তাঁর লোকজন এবং সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওপারে এসে থামলেন। তিনি দেখলেন যে, সাগরের মধ্যে এক আশ্চর্য্য রাস্তা। আরও দেখলেন, সেই রাস্তা ধরে মুসা ও তাঁর

লোকজনেরা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন সেই পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, তাঁর পিছনে অগণিত সৈন্য পরিষ্কার রাস্তা ধরে ছুটে চললো। যখন তারা সাগরের মাঝামাঝি এসে পড়েছে, এমন সময় খোদা দৈববাণীতে মুসাকে বললেন: মুসা, তাড়াতাড়ি সাগরের জলে তোমার লাঠি দিয়ে আবার আঘাত করো।

খোদার হুকুম মতো যেই তিনি সাগরের জলে আঘাত করলেন, অমনি দুই দিক থেকে জলের খাড়া উঁচু দেওয়াল ফেরাউন ও সৈন্যদের ওপরে পড়ে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। মরবার সময় তারা কাঁদবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পেলে না।

—শেষ—

এই লেখকের অন্যান্য বই

হাদিসের গল্প—১৲

সরল ভাষায় লেখা উপদেশে
ভরা গল্প।

গল্পের আসর—৸৹

কয়েকটি মনোরম গল্প। পড়িতে
বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া
যায় না।

চোর জামাই—৷৶৹

চোর কি করে জামাই হলো,
অথবা জামাই কি করে চোর
হলো—জান্‌তে যদি চাও আজই
একখানা পড়ে দেখো।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

মূল্য—৷৶৹ আনা

যেমন মজাদার গল্প ও ছড়া—
তেমনি মজাদার ছবি।

অতি দর্পে হতালঙ্কা—৷৷৶৹

মনোরম গল্প-কবিতা ও ছবি।

পয়গম্বরের গল্প—১৲

জঙ্গলের খবর—১৷৹

বোকা জামাই—৷৷৶৹